অমিয়ভূষণ মজুমদার

মহিষকুড়ার উপকথা

ও

একটি খামারের গল্প

বইয়ের নামঃ *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প*
লেখকঃ *অমিয়ভূষণ মজুমদার*
ভাষাঃ বাংলা
বইয়ের ধরণঃ উপন্যাস
প্রকরনঃ ইপাব (epub), মোবি(mobi)
পঠন সৌজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্রেরী
ই-বই তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

মহিষকুড়ার উপকথা

আমাদের এই গল্পটা মহিষকুড়া নামে এক নগণ্য গ্রামকে কেন্দ্র করে। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয়, বিস্তীর্ণ সবুজ-সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। এত ছোট, এত নগণ্য, চারিদিকের জঙ্গলে এমন ঘেরা যে তাকে আবিষ্কার করার জন্য জিপগাড়ির বহর সাজিয়ে অভিযান করলে মানিয়ে যায়; বরং সুখ ও মৃদু উত্তেজনার কারণ হয় : বনের হিংস্র জন্তুদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পিকনিকের আবহাওয়ায় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, কারণ মনে হতে থাকে এরা বোধহয় বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে।

.

এসব ধারণা অবশ্যই ঠিক নয়। একটু সাহস করে এদিক ওদিক হাঁটলে দেখা যাবে, অরণ্যের শালসারির ভিতর দিয়ে সরু সরু পায়ে চলা পথ আছে; গরুর গাড়ি, এমনকী জিপ চলতে পারে এমন একটা চওড়া মেটে পথ চোখে পড়া সম্ভব, যা এক গ্রাম থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। আর সে পথ শেষ হয়েছে বনের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া কালো কোনো পিচের পথে; কিংবা সে পথে কিছু দূর পর্যন্ত মিশে থেকে আবার তা থেকে পৃথক হয়ে আর একটি নগণ্য গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, যে গ্রামের নাম হয়তো তুরুককাটা, কিংবা ভোটমারি, কিংবা নিছক ছোট শালবাড়ি। সে সব গ্রামও জঙ্গলে ঘেরা।

তা, এদিকে এক সময়ে নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী ছিল, এখন যাকে এ জেলা সে জেলা নামে বিভক্ত করে পরিচিত করা হয়, সেই ভূমিকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করে। এমন গহন যে, এক রাজা তার সৈন্য-সামন্ত-অন্তঃপুর নিয়ে পালিয়ে থাকতে পেরেছিল। মীরজুমলার অনুচরেরা, বাঘা বাঘা ইরানি তুরানি তুর্ক, মাথায় কুল্লা-মুরেঠা-শিরপেচ, কোমরবন্ধে দামিস্কের কিরিচ, চোখে সুর্মা সুখ, মুখে চুস্তপুস্ত-খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে এ রাজ্যটাও আমাদের হল—এই ভেবে রাজ্য-রাজধানীর মুঘলাই নাম দিয়ে, রাজবংশের এক ছোকরাকে মুঘলাই নামে তখতে বসিয়ে গুম্ফে চারা দিয়ে মীরজুমলা আরো পূর্বদেশ কব্জা করতে রওয়ানা হয়েছিলেন। আমরা, অবশ্যই, গুম্ফের ব্যাপারটায় হলপ নেব না, কেননা মীরজুমলার গুম্ফ ছিল কি না তা ইতিহাস লেখে না। প্রবাদ এই : সাহেবান রাজ্যসীমার নদী পার হতে না হতে রাজার সৈন্যদল শালসারির মধ্যে দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছিল, রাজ্য-রাজধানী আবার দখল করেছিল, তখতনসিন সেই ছোকরা নয়ামুঘলের যারপরনাই হেনস্তা করেছিল।

.

যাক সে কথা, ইতিহাস খুব গোলমেলে গল্প। মহিষকুড়ার যে বন, তার জাতিগোত্র চিনতে পারাই আসল কথা। কালবশে সে অরণ্যের হ্রাস হয়েছে। নতুবা জেলাগুলির জন্ম হত না। মুঘল-তাতার-তুর্কি যার কাছে হার মেনেছিল, সেই বন যেন সাধারণ মানুষের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, এত ক্ষয় সত্ত্বেও সে অরণ্য এখন ইংরাজি নামের সম্মান পেয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট। সেই বনের মধ্যে এখনো নদী আছে, তীব্র স্রোতের ঝর্না আছে, তড়াগ-পল্বল-সরোবর আছে, এক প্রান্তে তো নীল পাহাড় আবেগের ঢেউ বুকে হিমালয়ের দিকে এগিয়েছে। তা হলেও নামেই প্রমাণ, এখন সে অরণ্য মানুষের কজায়। তার বুকে, যেন এক শত্রুরাজ্যকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতোই বা, কালো কালো পিচের রাস্তা-সড়ক। হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝরঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও, কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিকধিক করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন, যেন পাকা সড়কের বাইরে যাওয়া সব সময়ে নিরাপদ নয়। মনে হয়, কোথাও এমন আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে, যেন সেখানে এক দারুণ বন্য হিংস্রতা আছে যা মানুষের হিসাবকে ওলটপালট করে দিতে পারে। অন্যদিকে দেখো, এই মহিষকুড়া, কিংবা ভোটমারি, অথবা তুরুককাটা গ্রামগুলোকে : তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে। এসব দেখে আমার একবার মনে হয়েছিল, অরণ্যের দুই রূপ আছে, এক রূপে সে আশ্রয় দেয়, অন্যটিতে সে প্রতিহত করে। রাজাকে আশ্রয় দেয়ার সেই পুরাকালের ঐতিহ্য সে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু সেখানেই তার ভুল। সে প্রকৃতপক্ষে এক বোকা জামুরিনের মতো হার্মাদদের নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিয়ে বসেছিল। কারণ যারা বনের বুকে ফুটন্ত কালো গরম পিচ ঢেলে সড়ক তৈরি করে আর যারা লাঙলের পিছনে ধৈর্য করে এগোয়, তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাইয়ের তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়; লোভের লাঙলে পড়লে তেমন যে শাল-পদাতিকের নিরেট নিচ্ছিদ্র ব্যূহ, এক বনস্পতির এলাকা থেকে অন্য বনস্পতির এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিষমুখ কাটালতার তেমন যেসব ব্যারিকেড–সব ধ্বসে যায়।

কিন্তু মুশকিল এই, সংগ্রাম ও শান্তির প্রতীক হিসাবে তরবারি ও লাঙল ইউরোপের মানুষেরা এত বেশি প্রচার করেছে যে এখন আমাদের পক্ষে লাঙলের সঙ্গে লোভ শব্দটাকে যুক্ত করতে সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে। লাঙল যে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্ন হতে পারে, তা ভাবতেও অনিচ্ছা হয়।

আর তা হয়তো যুক্তিযুক্তই। বনের কি চেতনা আছে যে তাকে সহৃদয় কিংবা হিংস্র বলা যাবে? সমুদ্র, হিমালয়, কালবৈশাখী, কাকেই বা সহৃদয় কিংবা হিংস্র বলি?

বনে ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী যেমন আছে, তেমন, মুহূর্তে সে ক্রীড়াকে বিভীষিকায় পরিণত করে যে গ্রীবা কয়নের আদর আনত, তাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে চিরে রক্তপান করে এমন বাঘও আছে, বাস-ট্রাকের শব্দে অপমানিত বোধ করে ডালপালা ভেঙে শুড় তুলে ছুটে চলা হাতির দল আছে, আগুনের গোলার মতো লাফিয়ে পড়া বাঘকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে রক্তচক্ষু মহিষরাজ তার কালো, ছড়ানো, প্রকাণ্ড শিংজোড়া মেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে এমন হতে পারে, অযুত বিচিত্র চিত্র-দেহ পাখপাখালি আছে, তেমন আছে, বিষথলিযুক্ত ফণা তুলে খরিশ-গোখরো।কিন্তু সেই বাঘ, সেই হাতি, সেই মোষ, কিংবা সেই ফণী, এরাই কি কেউ হিংস্র?

বোধহয় তুলনাটাই বদলানো ভালো। অরণ্য সম্বন্ধে নানারকম কথা যে মনে হয়, যার কোনো একটাকেই যথার্থ যে মনে হয় না, তার কারণ বোধহয় এই যে, সে বরং অবচেতন মনের মতো। যেন করাতের কলের শান দেয়া ধার, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল তার, বাস-ট্রাকের দ্রুত গতিতে উচ্ছ্বসিত পিচ-সড়ক, এদিক ওদিক বনের গভীরে ডুবে থাকা গ্রাম, আর তাদের ঘিরে থাকা প্রাণীদের নিঃশব্দ, কখনো বা চাপা তর্জন-গর্জনযুক্ত পদসঞ্চারস্পন্দিত বন–এসব মিলে যেন একটাই মন, বন যে মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয়, তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফুট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

আমরা মহিষকুড়া গ্রামের কথাই বলছি, কিন্তু বনের কথা এসে গেল, কারণ বন থেকে এই সব গ্রামকে আলাদা করা যায় না।

এইসব গ্রামের নামের মধ্যে ছোট ছোট ইতিহাস লুকানো আছে মনে হয়। ভোটমারিতে নাকি স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ভুটিয়া দস্যুদের যুদ্ধ হয়েছিল। তুরুককাটায় নাকি মুঘলদের একটা ছোট বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। মহিষকুড়া নাকি প্রথমে বুনো মোষদের বিচরণস্থান ছিল, পরে বুনো মোষ ধরে যারা বিক্রি করে তাদের আড্ডা।

কুড়া ডোবা, জলা জমি এমনকী দহ হতে পারে, নদীখাতের গভীরতর অংশ। এ অঞ্চলের বড় নদীটা মহিষকুড়া গ্রাম থেকে এখন বেশ কিছু দূরে বনের আড়ালে। তখন মহিষকুড়া ছিল নদীর নাম। এখন সেই পুরনো খাতের চিহ্ন মহিষকুড়া গ্রামের প্রায় মাঝ-বরাবর ক্ষীণভাবে পরস্পর সংযুক্ত কয়েকটি ছোটবড় খাদ! এক দহের সঙ্গে অন্য দহের প্রণালী সংযোগের নাম ঝোরা। বর্ষার জলে ভরে ওঠে সেগুলি, অন্য সময়ে দু-একটি ছাড়া অন্যগুলি শুকিয়ে যায়। খুব ভারি বর্ষায় যখন কুড়াগুলোর মধ্যেকার সংযোগ বেয়েও জল চলে, আবার নদীর মতো দেখায়। নদী যখন বহতা ছিল, তখন এই নদীতে বারবার বুনো মোষের আড্ডা জমত। কিছু দূরে দূরে যেন নিজ-নিজ-চারণভূমির সীমার মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশটি করে মোষের এক-একটি দল। কোনো কোনো দলে নাকি শতাধিক মোষও থাকত। শীত পড়লে নদীর জল শুকিয়ে উঠতে থাকলে এই মোষগুলি

ধরতে একদল বেদিয়ার মতো মানুষ আসত এই অঞ্চলে। আমরা হাতি ধরার খেদার কথা জানি। সে কাজের বিপদ আন্দাজ করতে পারি। এই মোষ ধরার ব্যাপারও কম বিপজ্জনক ছিল না। মনে রাখতে হবে, দলবদ্ধ বুনো মোষকে বনের হিংস্র পশুরাও সমীহ করে চলে। জলের ধারে, আধডোবা চর ও ঘাসবনে এই বুনো মোষদের আড্ডা। এই বেদিয়াদের সেই আড্ডায় ঢুকতে হত। কখনো খোলা আকাশের নীচে, কখনো চরের উপরে বসানো খড়ের ছোট ছোট নড়বড়ে চালার তলে তাদের মূল ঘাঁটি বসত। এসব ঘাঁটি ক্রুদ্ধ ধাবমান মোষের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কখনো কখনো। শিঙের গুঁতোয়, পায়ের চাপে, প্রকাণ্ড শরীরের ধাক্কায় মানুষের মৃত্যুও ঘটত। সেই ঘাঁটি থেকে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে জলে নেমে, মোষদের ভয় দেখিয়ে, দড়িদড়ার ফাঁদে দমিয়ে ধরে ফেলার মধ্যে কৌশল ও বুদ্ধি যতটা লাগত, সাহসও তার চাইতে কম লাগত না। ক্লেশ তো প্রতিপদেই, কখনো মৃত্যুও ঘটে যেত। শিঙের ধাক্কায় নৌকা উল্টে যেতে পারত, ফাঁদে ফেলা মোষের দলের মধ্যে জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুও ঘটেছে দু-একবার। লাভের লোভে যেমন, নিজেদের পৌরুষকে কাজে লাগানোর নেশায় তেমন, এই বেদিয়ারা এই বিপজ্জনক ব্যাপারে নিজেদের নিযুক্ত করত। মোষ ব্রার তোড়জোড় করা থেকে শুরু করে তাদের কিছুটা পোষ মানিয়ে বিক্রি করা পর্যন্ত তিন-চার মাস তারা কাটাত এই অঞ্চলে। তখন থেকে এর নাম হয়েছে মহিষকুড়া।

.

সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেল, কেউ জানে না। এখনো এ অঞ্চলে কিছু মোষ আছে, তবে তা কারো-না-কারো বাথানের, অথবা কারো-না-কারো গাড়ি টানে, লাঙলটানা মোষ। বাথানের মোষগুলোর চেহারা ভালো। সেগুলোর বেশির ভাগই দুধেলা মোষ। বাচ্চা, মাঝবয়সি মোষও থাকে কয়েকটি করে। কোনো কোনো বড় বাথানে একটি-দুটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মোষও থাকে, যেমন মহিষকুড়ার জাফরুল্লা ব্যাপারির বাথানে। অধিকাংশ বাথানেই দুধেলা মোষের সংখ্যা চার-পাঁচটি। বাথানের মালিক অনেক সময়ে সে সব মোষ দিয়েও লাঙল চষায়। জাফরুল্লার বাথানে কিছুদিন আগেও ছোটবড় মাদি, মর্দা, বল-করা মিলে পঁচিশটা মোষ ছিল। তার মোষগুলোর চেহারাও ভালো। মোষগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা রিজার্ভ ফরেস্টের পাশে পাশে, অনেক সময় ফরেস্টের ভিতরে ঢুকে গিয়েও চরে বেড়ায়। মা আর বাচ্চাগুলো তো সারা বছরই। চাষের সময়ে বলদ-করা মোষগুলো চরে খেতে পায় না। আর সে সময়ে দুধ বন্ধ করেছে এমন গাবতান মানিগুলোকেও লাঙলে যেতে হয় দরকার হলে। অন্য সময়ে বলব-করা মোষগুলোও দুধেলা মোষগুলোর সঙ্গে বনে চরে। সউটিয়া বর্মন দুধ দুয়ে নেবার পরই তাদের ছেড়ে দেয় আজিজ আর সোভানের খবরদারিতে। মা মোদুটোই তাদের বাহন। যে দুটোকে বাগে রাখতে পারলে অন্য সবগুলো তাদের গলার ছোট ঘণ্টার শব্দ অনুসারে তাদের অনুসরণ

করে। দশ-বারো বছরের সেই ছোকরাদুটো গভীর বনে ঢুকেও নির্ভয়। অনুমান হয়, তার অনেকখানি মোদুটোর আকৃতি ও চালচলন থেকে পাওয়া। বনের মধ্যে সে দুটির ব্যবহার যেন দলপতির মতো। যতক্ষণ গ্রামের মধ্যে বাথানে, একবারও ডাকে কি না সন্দেহ-বনের মধ্যে থেকে থেকেই আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে। সে ডাকে বলল মোষগুলো, মালি, বাচ্চাগুলো দূর দূর থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

শুধু পুরুষদুটো নয়, বনে স্বচ্ছন্দ বিহারের ফলে জাফরুল্লার বাথানের সব মোষের স্বাস্থ্য ভালো, যেন আকারেও বড়; শহরের ধারে কাছে দেখা মোষদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে বন থেকে ধরে আনা মোষদের মতোও নয় তারা। তাদের বনের মধ্যে দেখে পোষমানা বলেই চিনতে পারা যায়। বুনো মোষ এ দিকে আর আসে না। যদি বছর দশেক আগেকার সেই ঘটনাটা, যার অনেকটাই ইতিমধ্যে অস্পষ্ট, তাকে গণনায় না আনা হয়।

.

রূপকথার মতো লাগে শুনতে। আসফাক শুনেছিল চাউটিয়ার কাছে। ভোটমারির এক গৃহস্থ তার মাদি মোষকে এনেছিল জাফরুল্লার বাথানে। এসব ব্যাপারে, যেমন বাথানের দুধ দোহার ব্যাপারে, কিংবা প্রাণীগুলোর কোনোটিকে রোগে ধরলেও চাউটিয়াই কর্তা। এমনকী বীজের দাম বাবদ দু-এক টাকা মাদি মোষের মালিকরা যা দেয়, তাও চাউটিয়ার প্রাপ্য।

চাউটিয়া প্রথমে ভোটমারির সেই গৃহস্থকে জাফরুল্লার মোষদুটির মধ্যে একটাকে পছন্দ করতে বলেছিল। আকারে-প্রকারে, বলবীর্যে দুটো প্রায় একই রকম। বয়সে ছ-সাত বছরের তফাত। সম্বন্ধে পিতাপুত্র বলতে পারো। বুনো অবস্থা হলে দলপতি কে হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়ার সময় হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনটি হারত, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এসব শুনে সেই গৃহস্থ তরুণতরটিকেই পছন্দ করবে মনে হয়েছিল, কিন্তু চাউটিয়া পরামর্শ দিয়েছিল বয়স্কটাকে নিতে।

সেই সূত্রেই এই গল্পটা বলেছিল চাউটিয়া : তখন আশ্বিনের শেষ রাতে গা শিনশিন করতে শুরু করেছে। সকালে বনের গায়ে কিছু কুয়াশা দেখা দিতে শুরু করেছে। বছর দশেক আগের কথা। জাফরুল্লার বাপ ফয়েজুল্লা তখনো বেঁচে। চাউটিয়ার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। তখনো সে এই বাথানেই কাজ করে। চাউটিয়ার বাপ নাকি মোষধরা ফালি ছিল। যাক সে কথা, আশ্বিনের ভোরের প্রথম শীতের আমেজে অন্য লোকে যখন কাঁথা টেনে নিয়ে পাশ ফেরে, বুড়ো ফয়েজুল্লা তখনই উঠে পড়ত। আর তার দিনের প্রথম কাজই ছিল দ্বারিঘরে এসে বসে বেশ বড় এক কলকে তামাক প্রাণভরে টানা। দিনের আলো তখন অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া। ফয়েজুল্লা অলর থেকে তার হুঁকা হাতে দ্বারিঘরের কাছে প্রায় এসে পড়েছে, হঠাৎ মোষের

ডাকাডাকি তার কানে গেল। সাধারণ ডাকাডাকি নয়, অস্বস্তিতে সে থেমে দাঁড়াল। কিন্তু নেশার টান। সে দেখতে পেল, চাউটিয়া দ্বারিঘরের কাছে খড়ের বোঁদায় আগুন দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে, তামাকের আগুন। সুতরাং সে দ্বারিঘরের দিকেই হেঁটে চলল।

কিন্তু অস্বস্তিটা যাওয়ার নয়। কলকে হুঁকায় চড়াতে গিয়ে সে থমকে গেল। বাথানটা দ্বারিঘর থেকে উত্তর-পূর্বে পঞ্চাশ হাত দূরে। প্রায় মানুষসমান উঁচু, দোলা বাঁশের চেকোয়ার, শালকাঠের খুঁটি দিয়ে শক্ত করা। কিছু কুয়াশা সেদিকে। সেই কুয়াশার মধ্যে সেই মানুষসমান উঁচু বেড়ার মাথার উপর দিয়ে একটা মোষের কাধ আর উঁচু করা শিংসমেত মাথা। অভ্যস্ত চোখের এক পলকেই সে বুঝতে পারল, সাধারণ মোষ নয় সেটা। অপরিচিত তো বটেই আর সেজন্যই বাথানের ভিতরের মোষগুলোর ডাকাডাকি। তাদের ফোঁস ফোঁস শব্দও যেন এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। বাইরের মোষটা বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় সামনের দু-পা বাধিয়ে খাড়া হয়ে উঠল একবার। কী তার মাথা, আর কী তার শিং! ফয়েজুল্লা বলল, বুনা?

মনৎ খায়।

মোষটা সেদিক দিয়ে বাথানে ঢুকতে না পেরে আরো উত্তেজিত হয়ে পুব দিকে ঘুরে এল। তখন তাকে সবটা দেখা গেল; উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একটা পাহাড়। দুটো শিং যেন দেড়গজ করে, মাথাটা সাধারণ মোষের সোয়াগুণ, কাঁধের কাছে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু, সেখানে আবার ঝকড়া ঝকড়া পশম। মনে হল বাথানের বেড়া ভেঙে ফেলবে এবার। আর তাও যদি না করে, বাড়ির ভেতরে ঢোকে যদি, কিংবা গোয়ালঘরে, মানুষ মারতে পারে, গোরু জখম হতে পারে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল চাউটিয়া আর ফয়েজুল্লা। এদিকে তখন বাথানের ভিতরে মোষের ডাকাডাকি, আর বাইরে সেই যমদূতের আস্ফালন। বেড়ার ফাঁক পেতে ঘুরছে সে। মাথা নামিয়ে আক্রমণের ভঙ্গিতে ফোঁস ফোঁস করছে। খুর দিয়ে মাটিতে গর্ত করছে। ভয়েই বুদ্ধি যোগাল প্রথম। তারপর বুদ্ধিটাকে ফয়েজুল্লার পছন্দই হল।

জানোয়ারটা মানুষের গলা না শোনে এমন ভাবে গলা নামিয়ে ফয়েজুল্লা বলল, ডাকপাড়া মাদিটাক ছাড়ি দেও।

যে মাদি মোটা ডাকছে। ভোরের অন্ধকারে যার ডাক এই বুনোটাকে টেনে এনেছে, সেটাকে ছেড়ে দিলে অন্য মোষগুলো-সমেত বাথান নিরাপদ হবে; মহিষকুড়ার উপকথা কারণ দুটোই সে ক্ষেত্রে বনের দিকে চলে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি মাদিটা বুনোটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনতে পারে, একটা ভালো মোষ লাভ হয়ে যায়। এই শেষের যুক্তিটা মনে হতেই ফয়েজুল্লার চোখের কোণে হাসি দেখা দিয়েছিল। এরকম একটা কথা আছে বটে, যদিও ফয়েজুল্লার মুখের সামনে কেউ বলে না, যে, তার বাবা

নাকি ভৈষ-বাউদিয়াদের দলপতি ছিল এক সময়ে, যদিও ফয়েজুল্লার এখন অনেক জমিজিরাত।

কিন্তু মার্দিটাকে বাথানের বাইরে বের করে দেয়া সোজা কথা নয়। বাথানের ভিতর ঢুকতে হবে। বাইরের ওই খেপে যাওয়া বুনোটাকে এড়িয়ে বাথানের বিশহাতের মধ্যে যাওয়া মানে নিজেকে খুন করা! ভাবতেও গলার ভিতরটার শুকিয়ে যায়।

চাউটিয়া উবু হয়ে বসেছিল। নিজের দুই হাঁটুর পাশ দিয়ে হাতদুটোকে সামনে এনে আঙুলে জড়িয়ে এহাতে ওহাতে ধরল। যেন আড়মোড়া ভাঙল। এমন শক্ত করে এহাতে ওহাতের চাপ যে আঙুলের গাঁটগুলো পটপট করে ফুটল। আলসেমি তাড়ানোর ভঙ্গিই যেন, কিন্তু এ আলসেমি ত্রিশ বছরের। তার বাপ ফান্দির কাজ ছেড়ে দেয়ার পরে যে দশ বছর বেঁচেছিল, তার বাপের মরার পর থেকে তখন পর্যন্ত তার নিজের জীবনের বিশ বছর, একুনে যে ত্রিশ বছর ফালির দড়িতে হাত পড়েনি, সেই ত্রিশ বছরের আলসেমি ভাঙতে চেষ্টা করছে যেন চাউটিয়া।

বাথান আর দ্বারিঘরের মাঝখানে যে পঞ্চাশ হাত, তাতে আড়াল আবডাল খুবই কম। দুটো আশশেওড়া আর একটা বুনো কুলের ঝোপ। ছোট ঝোপ, এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যায়। মাঝে মাঝে ঘাস আছে এক-দেড়-হাত উঁচু, কিন্তু বেশির ভাগ জমি দূর্বা ঢাকা। সব চাইতে বিপদের এই, বাথানের বেড়ার কাছে চারপাত জমি একেবারে ফাঁকা! বাথানের দরজার দিকে যাওয়াই যাবে না। তার কাছাকাছিই বুনোটা। একেবারে উলটো দিক দিয়ে বাথানের বেড়া বেয়ে উঠে বাথানের ভিতরে নেমে ডাকপাড়া মার্দিটাকে আলাদা করে দরজার কাছে নিয়ে এসে সেটাকে বার করে দিতে হবে; এক হাতে হুড়কো তুলতে হবে, অন্য হাতে তাড়াতে হবে মার্দিটাকে। যদি বুনোটা টের পেয়ে যায়, বেরনোর পথে মার্দিটাকে যদি দেখে ফেলে, তবে সেটা তেড়ে আসবেই। তখন মার্দিটাও বাথানে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। বুয়ের ধাক্কায় শিঙের গুঁতোয় প্রাণ যাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে।

গামছাটাকে লেংটির মতো করে পরে, লম্বা সরুগোছের একটা পেন্টি পিঠের উপরে নেংটির ফাঁদে গুঁজে, বুকে হেঁটে চাউটিয়া বাথানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। বুনোটা তখন বাথানের পূর্ব দিকে। দক্ষিণঘেঁষা পশ্চিমে বাথানের গা-ঘেঁষা জামরুল গাছটায় উঠে, তার ডাল বেয়ে এগিয়ে, তা থেকে ঝুল খেয়ে বাথানের ভিতরে নেমেছিল চাউটিয়া। ডাকপাড়া মার্দিটাকে খুঁজে নিয়ে দরজা খুলে বের করে দিয়েছিল। মার্দিটা মুখ বার করতে না করতে আর একবার ডেকে উঠল, আর একই সঙ্গে ঝড় আর ভূমিকম্পের মতো তেড়ে এল বুনো। ভাগ্য ভালো, মার্দিটা বাথানের দিকে না ফিরে বাইরের দিকে ছুটল।

সেই সময় চাউটিয়া বুনোকে ভালো করে দেখেছিল। সামনার ঠ্যাং দুনা পিছলা ঠ্যাং দুনার চায়া আধা হাত উঁচা। সিংঅর ছবি দেখছেন তোমরা? কান্ধতে তেমন চুল।

ভোটমারির সেই গৃহস্থ বলেছিল, থ্রুস, তোমরা দেখি মস্করা করেন।

তার বিস্ময় ও অবিশ্বাস স্বাভাবিক। মোষ সে অনেক দেখেছে, তার নিজেরও গোটাকয়েক আছে। হতে পারে সেই বুনোটা প্রকাণ্ড ছিল, তাই বলে ওরকম অদ্ভুত গড়ন হয় না।

কিন্তু আগ্রহভরে আসফাকও শুনছিল গল্পটা। সে নড়ে বসে বলল, তার পাছৎ?

গল্পটার শেষটুকু এই রকম : ঘণ্টাখানেক পরে ভালো রকম নাস্তা মেরে মজবুত হাত-ত্রিশেক লম্বা দড়ি, হালকা দা, বেতের পেন্টি (লম্বা সরু মজবুত লাঠি), কয়েক দিনের মতো চিড়া-গুড়-লঙ্কা-নুন নিয়ে নেংটিপরা চাউটিয়া মোষের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল।

ভোটমারির লোকটি জিজ্ঞাসা করল, চাউটিয়া এই বড় মদ্দাটাকেই সেই বুনো বলে বোঝাতে চাচ্ছে কিনা।

চাউটিয়া বলল, সে মোষ ব্রা যায়নি। সেটা মোষ কিনা তাও সন্দেহ আছে। মাদিটাকে অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল সাতদিন পরে। ফয়েজুল্লা খুব ঠাট্টা করবে ভেবেছিল। কিন্তু করেনি। সেও মোষটাকে দেখেছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, মাদিটা গাবতান। এই মদ্দাটা সেই বাচ্চা। আর ছোটটা সেই বাচ্চার বাচ্চা।

সেই দশ বছর আগে একবারই বুনো মোষের দেখা পাওয়া গিয়েছিল মহিষকুড়ায়। তবে সে মোষও অদ্ভুত। চাউটিয়া তো বলে, জাতেই খানিকটা আলাদা। গায়ের রং কালোয় খয়েরি মেশানো। তাকে কি ধরা যায়? খানিকটা দেয়াসী নয়? দেয়াসী মানে দেবাংশী। দেবতার অংশে যে জাত। তা, সেই সাহেব বলেছিল, ওটা মোষই নয় হয়তো-বাইসন ছিল।

সাহেব বলতে তারা নয়, যারা বিলেত থেকে এদেশে আসত আগে। এদেশেরই কালো-কোলো মানুষ, জিপগাড়িটাড়িতে যায় আসে, নাকি মাজিস্টর, খুব পায়োর।

পায়ের শব্দটা আসফাক শিখেছে কিছুদিন আগে। ইংরেজি পাওয়ার শব্দটাই। আসফাক যতদূর পেরেছে উচ্চারণ করতে, এর বেশি তার কাছে আশা করা যায় না। আর কী আজব এই শব্দ! জাফরুল্লার চশমার পায়োর বদলানোর সেই গল্প কে না জানে? ছমির বলে, পায়োর বদলাতে গঞ্জে গিয়েই জাফরুল্লা তিসরা বিবিকে দেখতে পেয়েছিল। জাফরুল্লা নাকি এতদিন বুঝতে পারেনি, তার বড় আর মেজ বিবির বয়স হয়েছে। আবার দেখো, জাফরুল্লার সেই বন্দুকের পায়োর। সরু লাঠির মতো কালো চকচকে

সেই নলটা থেকে যা বের হয় তা নাকি জমানো জমাট পায়োর, যার এক ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ। নিথর হয়ে যায়। মাজিস্টরদের তো বটেই, এমনকী যারা মাজিস্টর নয় অথচ তার মতো পোশাক পরে!-পোশাকের কী পায়োর দেখো। আর দেখো, সেই বুনোটা যে দশ বছর আগে একবার এসেছিল তার কী পায়োর, এ অঞ্চলের অনেক মোষ আকারে-প্রকারে এখন অন্য মোষ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার পায়োরের ফলে।

আসফাক পথে পথে চলতে চলতে এসব কথাই ভাবছিল। সে জাফরুল্লার জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছে। মহিষকুড়ায় ডাক্তার নেই। একজন আছে বটে, যে অন্যান্যদের মতো খেতখামারের কাজ করে, দরকার হলে এগাছ ওগাছের ছালকলাশিকড় জ্বাল দিয়ে কিংবা তাদের পাতার রস দিয়ে বড়িটড়ি তৈরি করে দেয়। কিন্তু জাফরুল্লার এখন শহরের ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া চলে না। রোজই নাকি তাকে ওষুধ খেতে হয়। তা জাফরুল্লার বয়স ষাট তো হলই। ওষুধগুলো যতক্ষণ হাতের কাছে থাকে ততক্ষণ জাফরুল্লাকে শক্তসমর্থই মনে হয়, ওষুধের অভাব হলে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। শেষ হতে কতক্ষণ?

আসফাক তখন দ্বারিঘরের আর বাথানের মাঝের মাঠটায় এক ছোকরার সঙ্গে হাত লাগিয়ে পাটের সুতলি পাকিয়ে গোরুমোষ বাঁধার দড়িদড়া তৈরি করছিল। মোষের মতো অনেক গরুও আছে জাফরুল্লার। সংখ্যায় বরং গরুই বেশি। চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো বটেই। এই অঞ্চলে এই গরুগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ণবয়স্ক হলেও আকারে এত ছোট যে দূর থেকে তাদের চলতে দেখলে রামছাগলের দল বলে ভুল হয়। তাহলেও এগুলোর মধ্যে ষাঁড়, বলদ, গাভী আছে। গাভীগুলোর এক-আধপোয়া দুধ হয়। বলদগুলো দরকার হয় তামাকের খেতে চাষ দিতে, যেখানে মোষ দিয়ে চাষ চলে না। ষাঁড়গুলো দলের শোভা বৃদ্ধি করে, গাভীদের শান্ত রাখে, আর মাঝে মাঝে তাদের দু-একটাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাভীগুলোর দুধের একটা গুণ আছে। জাফরুল্লার এখন মোষের দুধ সহ্য হয় না, মুন্নাফ আরো কিছু বয়স না হলে মোষের দুধ ধরবে না। গাভীর দুধ তাদের জন্য আলাদা করে দুইয়ে দেয় আসফাক। কিন্তু এই গোরুর পালের আসল উপকারিতা গোবর–যা তামাকের খেতের পক্ষে অপরিহার্য। সেই খেতের জন্যই গোরু পোষা। মোষের গোবরে কেন তামাকের সার হয় না-এ সব নির্বোধ ছাড়া কেউ আলোচনা করে না।

তা, মুন্নাফ বললে, এই যে মিঞাসাহেব শোনেন, আব্বাজানের ওষুধ ফুরাই গেইছে, শহরৎ যাওয়া লাগে।

আসফাক ধীরে ধীরে বলেছিল, শহর?

হ্যাঁ, পিরহান পিন্ধি আসেন তোমরা।

আসফাক সেই বলদদের ঘরে গিয়ে দেওয়ালে গোঁজা জামাটা ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিয়ে এসেছিল। আর মুন্নাফ তাকে খুচরোয় নোটে মিলিয়ে আট-দশটা টাকা এনে দিয়েছিল আর একখানা কাগজ। শহরের দোকানটা আসফাকের চেনা। কাগজ দেখালেই ওষুধ দেবে।

মুন্নাফকে কে না চেনে এ গেদে? জাফরুল্লা ব্যাপারির একমাত্র ছেলে। তার চার নম্বর বিবির দরুন চার বিবি মিলে ওই এক সন্তান।

আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল।

আসফাক কেন? আসফাককেই কেন ওষুধ এনে দিতে হবে? তার অবশ্য; কারণ আছে। জাফরুল্লার খামারে কে কী কাজ করবে, তা ঠিকঠাক বলে দেয়া আছে। যেমন মোষের বাথানের কঠিন কাজগুলোর ভার চাউটিয়ার উপরে। দুধও দোয়ায় সে। আর দুধ দোয়ানো হলে সেই দেড়-দুইমণ দুধ বাঁকে নিয়ে শহরের দিকে যায়। রোজ সে শহরে ঢোকে না; শহরের তিন মাইলের মধ্যে দুই পিচের সড়কের মিল পর্যন্ত যায়; যেখানে এখন শহরের গোয়ালারা এদিকের সব বাথানের দুধ কিনতে আসে। সেখানে উনুন জ্বেলে ছানাও তৈরি করে। তাতে দুধ পচার ভয় এড়ানো যায়। আর মোষের দুধের ছানা গরু-দুধের ছানা বলে শহরে ঢোকে। চাউটিয়া তাদের চাইতেও তরখর। দুধ দোয়ানো হলে সে অনেক সময়েই মাখন তুলে নেয় এক সের, দুধ বেচতে যাওয়ার আগে।

ছমিরের কাজ খড়ি ফাড়া, তরকারি-বাগান তদ্বির করা, হাঁসমুরগি দেখে রাখা। তার একটা বিশেষ কাজ আছে। খাসি হোক, এঁড়ে হোক, তার জবেহ করা, ছাল ছাড়ানো। আর বছরে একবার সেই দৃশ্যটা দেখা যায়–মোষ, গরু, পাঁঠাকে খাসি করা। এ ব্যাপারে অন্য লোকের সাহায্য দরকার হয়, পশুগুলোকে মাটিতে চেপে ধরে রাখতে হয়। তারা রাগ প্রকাশ করে, আর্তনাদ করে, পা ছোঁড়ে, ছটফট করে যন্ত্রণায়। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কিন্তু বোধহয় তার আকর্ষণও আছে। কাছাকাছি যারা অন্য কাজে থাকে, তারাও কাজ ফেলে কাছে এসে দাঁড়ায়। ঝিদের দেখতে দেখা গিয়েছে আড়াল থেকে। এমনকী জাফরুল্লার তিসরা বিবিকেও সেই ভিড়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার দেখা গিয়েছিল। এ ব্যাপারে আসফাক বাঁশের একমাথা মাটিতে চেপে ধরে রাখা ছাড়া কিছুই করেনি এ। পর্যন্ত। ছমির কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয় না, তার হাত কাঁপে না। কী কী করতে হবে, তা যেন তার মুখস্থ। একবার তো সে আসফাককে বলেছিল-নাও, মিঞা, চোখ খুলি ফেল। হয়া গেইছে। আসফাক চোখ খুলেছিল কিন্তু পশুটার অন্তরঙ্গ দিকে না চেয়ে বরং তার চোয়ালের দিকে চেয়েছিল, আর তার মনে হয়েছিল, সেই মোষের এঁড়ের বড় বড় চোখ দিয়ে জল পড়ে সর্দির মতো শুকিয়ে আছে চোয়ালে। ছমির কিন্তু এই পরবটার জন্যই যেন উৎসুক হয়ে থাকে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেদিন তার এবং যাদের সে সঙ্গী করে তাদের আর কোনো কাজ থাকে না, একের পর এক পশুকে, ছমিরের ইয়ারকি, সুন্নৎ করে।

নসির আর সাত্তারকে লাঙলদার মনে হবে। লাঙলদার এখানে কে নয়? সেরকম চাপের তাড়া পড়লে, প্রকৃতির খেয়ালে তা পড়েও, এমনকী জাফরুল্লাও পাঁচ-সাত বছর আগে পর্যন্ত নিজেই লাঙল ধরেছে। কিন্তু সাত্তার আর নসিরের কাজ তামাকের খেতে। অনেক সময়ে তাদের সাহায্য করতে দিন-হাজিরায় লোক রাখতে হয়, কিন্তু জমি চষা থেকে শুরু করে পাতাকেটে তোলা পর্যন্ত সে খেতগুলোতে তারাই ওস্তাদ। কী আদরতু সেইসব জমির আর তার ফসলের, ধান তার অর্ধেক পেলে ধন্য হয়। সারা বছরই যেন নসির আর সাত্তার সেই জমিতে লেগে আছে। চাষ দিচ্ছে, খড়কুটো জড়ো করে পোড়াচ্ছে, সার দিচ্ছে, আল বাঁধছে। আর পাতা কাটা? তখন তো তাদের সেরা ওস্তাদি। তখন সেসব খেতে কারো নামাই বারণ। একবার আসফাক একটা তামাকগাছে কাস্তে বসিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে জাফরুল্লা ছুটে এসে এমন এক থাপ্পড় কষিয়েছিল যে সারা জীবনে তা ভুলতে পারা যাবে না। তামাক নাকি বিষ! তারই যত্ন-দেখো। বিষের জ্বালা মুখ থেকে ফেলতে থু থু করে থুক ফেলল আসফাক।

কাজ তত ভাগ করাই আছে, কিন্তু শহরে যাওয়াই যদি কাজ হয়, তবে চাউটিয়া নয় কেন? সে তো রোজকার মতো আজও শহরের তিন মাইলের মধ্যে সেই সলসলাবাড়িতে গিয়েছে দুধ নিয়ে। সে অনায়াসেই আরো তিন মাইল এগিয়ে শহরের দোকান থেকে ওষুধ এনে দিতে পারত। আর কোনো কোনো দিন সে ওই তিনমাইল পথ পার হয়ও। সরষের তেল, কেরোসিন তেলের টিন, দুধের খালি টিনগুলো বাঁকে বসিয়ে নিয়ে আসে। মশলাপাতির জন্যও সেই শহরে যায়। কিন্তু ওষুধের বেলায় আসফাক কেন? ছমিরের ঠাট্টা মনে পড়ল আসফাকের-নাকি তিসরা আর বিশেষ করে চৌঠা বিবির ঘরে এই ওষুধ মুখে যাওয়া লাগে। ছমির বলে আর হাসে।

শহরে যাওয়ার দুটো পথ আছে। উত্তর আর পশ্চিমের ঠিক মাঝামাঝি দিক ধরে গিয়ে পাকা পিচ সড়ক। সেই সড়ক ধরে দক্ষিণ-পূর্বের চাইতে বরং পূর্ব ঘেঁষে পাঁচ-সাড়েপাঁচ মাইল নামলে শহর। দ্বিতীয় পথ, তাকে অবশ্য পথ বলা হবে কি না সন্দেহ, মহিষকুড়া থেকে যে পায়ে-চলা পথ দক্ষিণে গিয়ে বনে ঢুকেছে, সেই পথে গিয়ে বনে ঢুকতে হবে, আর তারপর বনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে চারমাইল গেলেই শহর। বনের এই পথ আদৌ নির্দিষ্টনয়। এমন হতে পারে, এই চারমাইল যেতে দ্বিতীয় মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না। বর্ষাকালের ছোট ছোট নদী, ঝর্না, ঝোরা পড়ে সে পথে। একটু বেহিসেবি হলেই দিক ভুল হতে পারে। গাছের নীচে নীচে চলতে চলতে একমানুষ সমান কোনো ঘাসের জঙ্গলে পৌঁছাতে পারো যার মধ্যে দিয়ে চলা যায় না, আর তাকে ঘুরে চলতে গিয়ে এমন বনে পৌঁছানো সম্ভব যা হয়তো শহর থেকে সাত-আট মাইল দূরে নিয়ে যাবে।

চাউটিয়া এই বনের পথ ধরেও শহরে যায়। আসফাকও কয়েকবার গিয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে পায়ে পায়ে ঘাস মরে গিয়ে পথ হয়েছে। প্রত্যেককেই

প্রতিবারে নিজের আন্দাজ মতো চলতে হয়। ঝোপঝাড়ের চেহারা দেখেই পথ ধরতে হয়। অথচ বনে এই ঝোপঝাড়ের চেহারা রোজ বদলায়, ঋতু অনুসারে তারা বাড়ে কমে। এক কথায়, সেই বনের সংজ্ঞা যাকে অবচেতন মনের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে।

তা হলেও অষুধ বলে কথা। যার অভাবে অমন যে দারুণ জাফরুল্লা তার মরণও ধরা কথা । আসফাক গ্রাম থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি হেঁটেছিল। তারপর একটা ধীর নির্দিষ্ট গতিতে চলছে। এই গতিটার এক বৈশিষ্ট্য আছে। দেখলে মনে হবে, অলস উদ্যমহীন। আসলে কিন্তু সহিষ্ণু আর অচঞ্চল। গাড়ির আগে মোষের চলার ভঙ্গির সঙ্গে মেলে। শিংদুটোকে পিছন দিকে হেলিয়ে মুখটা একটু তুলে, সে চলেছে তো চলেছেই। যেন সে জেনে ফেলেছে, যে অস্বাভাবিক কষ্টদায়ক ব্যাপারটা তার কাঁধের থেকে ঝুলতে ঝুলতে তার পিছন পিছন চলছে-যত জোরেই যাও সে কাঁধ ছাড়বে না, পিছনে আসাও বন্ধ করবে না। বরং জোরে গেলে সে আরো জোরে পিছনে আসে, তখন হঠাৎ থামতে গেলে সে পিছন থেকে এমন ধাক্কা দেয় যেন পড়ে যেতে হবে। আবার যদি আস্তে আস্তে চলা যায়, তবে পিছনের সেই বোঝার ধারালো গায়ে লেগে পিছনের পাদুটোয় ঘা হয়ে যাবে।

আসফাক ভাবল : সেই বুনো মোষটার কিন্তু জোড়া নেই যে তাকে লাঙলে কিংবা গাড়িতে লাগাবে। সে মাথাটাকে একটু পিছনে হেলিয়ে মুখটাকে একটু তুলে হাঁটতে লাগল। শিং দোলানোর মতো একবার সে মাথা দোলাল।

সেই বুনো মোষ যখন এসেছিল তখন আসফাক খামারে আসেনি। কিন্তু সেই সাহেবকে যখন চাউটিয়া গল্পটা বলেছিল, তখন আসফাক দ্বারিঘরের বারান্দার নীচে বসে পাট থেকে সুতলি তৈরি করতে করতে শুনেছিল। এ তো বোঝাই যাচ্ছে, চাউটিয়া সুযোগ পেলেই সেই খয়রা রঙের পিঠ-উঁচু বুনোটার কথা বলে। তা, সে সাহেব শুনে বলেছিল ওটা বাইসনই ছিল। এদিকের জঙ্গলে বাইসন থাকা অসম্ভব নয়। কোচবিহার রাজবাড়ির বাইরের করিডরে সারি সারি বাইসনের মাথা সাজানো। কোন জঙ্গলে কোন তারিখে মারা, রুপোর ফলকে তাও লেখা আছে। আর ১৯৫০-৫২-তে কোচবিহার শহরেই এক বাইসন এসেছিল। আর রাজামশাই তাকে গুলি করে মেরেছিল। কিছুক্ষণ পরে সাহেব চাউটিয়ার মন রাখতে বলেছিল, তো, বুনো মোষও হতে পারে। মানুষে মানুষে চেহারার পার্থক্য থাকে। যেমন দেখো আসফাককে, ওর গায়ের রং মুখের চেহারা এখানকার অন্য সকলের থেকে আলাদা। জন্মের সময় ধাক্কাধুক্তি লেগে হয়তো মোষটার কাঁধের হাড় উঁচু হয়ে গিয়ে থাকবে।

আসফাক ভাবল : ফান্দি কিন্তুক সে ভইষাক বান্ধির পায় না।

চাউটিয়া হয়তো ফান্দি হিসাবে তার বাপের মতো ওস্তাদ নয়, তাহলেও এ-অঞ্চলে চাউটিয়াই একমাত্র ফান্দি। সেও ব্যর্থ হয়েছে সেই মোষকে ধরতে। আসফাক দেখল, তার সামনে একটা ঘাসবন। বনটা নতুন হয়েছে। কুশের জাত। এক কোমর উঁচু হবে। সেই ঘাসের গোড়ায় এক রকমের লতা। তাতে নাকছাবির মতো ছোট ছোট নীল ফুল। আসফাকের মনে পড়ল, এই ঘাস মোষেরা খুব পছন্দ করে। গরু খায় বটে, তা উপরের নরম নরম অংশ। মোষ শক্ত গোড়া পর্যন্ত। ছাড়ে না। ঘাসবনটাকে ঘুরে যেতে হবে। আসফাক বাঁয়ের দিকে সরল। খুব বড় নয় এই নতুন গজিয়ে ওঠা বনটা; এখনো সব ঘাসই কচি। মোষের দল এখানে এলে নড়তে চাইত না।

কিছুদূর গিয়ে আসফাকের মনে হল, সে যেন একটা মাদি মোষের পিঠে শুয়ে, আছে আর মোযটা ঘাস খেতে খেতে হাঁটছে। তা মাদি মোষের পিঠে শুতে প্রথম ভয় করেই। পরে অভ্যাস হয়ে যায় আর তখন মোষের গলার দুদিকে পা নামিয়ে তার পিঠ বরাবর শুয়ে পড়লেই হল। কখনো গান গাওয়া যায়, কখনো ঘুমের ভাব আসে।

আর এ ঘাসও খুব মিষ্টি। লটা বলে। গোড়ার কাছে একরকম মিষ্টি রস থাকে। মানুষই ভালবাসে, মোষের তো কথাই নেই। একছড়া ঘাস উপড়ে নিল আসফাক। অন্যমনস্কের মতো গোড়াটাকে মুখে দিল। চুষে মিষ্টি বোধ হওয়াতেই যেন খুঁতখুঁত করে হাসল।

আরউ, এ দেখং ভইষার গোবর!

ঘাসবনের ধারে মোষের শুকনো গোবর দেখে আসফাক হতবাক। সে চারিদিকে তাকাল। এদিকে তাহলে মোষ আসে! বুনো মোষ নাকি? কয়েক পা গিয়ে সে আবার দাঁড়াল। তার গা ছমছম করে উঠল। আবার সে চলতে লাগল। এখানে কি কোনো বাথান থেকে মোষ আসে? আবার সে খুঁতখুঁত করে হাসল। পরমুহূর্তেই তার গা ছমছম করে উঠল। এ তো সত্য কথাই যে সে তার পরিচিত ঝোপঝাড় একটাও দেখতে পাচ্ছে না। সে অবাক হয়ে থেমে দাঁড়াল। তাই তো, সে কোথায় এসেছে? নিজের হাতে ঘাসের ছড়া চোখে পড়ল। ঘাস খায় কেন সে? সে আর একটা ঘাস মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার হাঁটা শুরু করল। তা হলে ওটা কি, এসবই কি বুনো মোষের চিহ্ন!

অজ্ঞাত একটা ভয়ে শিউরে উঠল সে, আর তার ফলেই যেন ছলাৎ ছলাৎ করে খানিকটা কালো কালো সাহস তার বুকের মধ্যে পড়ে গরম করে তুলল সেই জায়গাটাকে।

ঘাসবনটাকে ঘুরলে চলবে কেন? কতদূরে শেষ-কে বলবে? এর মধ্যে দিয়েই পথ করে নিতে হবে। সে ঘাসবনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সরসর করে ঘাসের ঢেউ তুলে তুলে সে চলতে লাগল। ঘাসবনের মধ্যে কাঁটাগাছ থাকে, মরা মরা ঝোপঝাড়ের শুকনো ডালপালাও কাঁটার মতো ধারালো

হয়। একটায় লেগে তার পিরহান বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয়বার পিরহানে টান পড়তেই সে সেটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল। খুঁতখুঁত করে হাসল সে। তার শেষবারের মতো মনে হল, এ পথে কি শহরে যাওয়া যায়? সে কি পথ হারিয়ে ফেলেছে? এখন সে যতই হাঁটবে, ততই বনের গভীরে ঢুকবে? সে আবার থমকে দাঁড়াল। দেখলে, ঘাসবনের উপরে উপরে এখন গাছের মাথাগুলো এক হয়ে হয়ে ক্রমশ ঘন ছায়া করছে। সে দেখল, তার নিজের গায়ে গাছের পাতার ছায়া। এদিকে মোষ থাকতেই পারে, কারণ পায়ের তলার মাটি ঠান্ডা, কেমন। জল-জল ভাব আছে। সে হঠাৎ মাথা তুলে ডাকল, আঁ-আঁ-ড়। যেন সে তার মোষদের ডাকছে।

সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবি আঁকছিল, তার মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা, নানা রেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরো জোরে আরো টেনে আঁ-আঁ-আঁ-ড়শব্দ করে উঠল। কান পেতে শুনল, প্রতিধ্বনি যেন একটা উঠছে। আর সেই মুহূর্তে সে অনুভব করল, সে মোষ হয়ে গিয়েছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই, এই ভেবে তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে ফোঁসফোঁস করতে লাগল। সে প্রাণভরে ডেকে উঠল, আঁ-আঁ-ড়।

.

জাফরুল্লা ব্যাপারির খামারে এখন সকাল হচ্ছে। আর উঁচু দ্বারিঘরের খড়ের ছাদের ওদিকে যদি আকাশে এখনো কোনো রং থাকে, তবে এদিক থেকে, তা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বড়জোর একফালি ধারে মরচেধরা কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।

দ্বারিঘরটা ক্রমশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। খড়ের চালই, এখন যেন তা আগের চাইতে পুরু। আগে ধারার বেড়া ছিল, এখন কাঠের মসৃণ দেয়াল। যার বাইরেটা সবুজ আর ভিতরটা উজ্জ্বল সাদা রং করা। শুধু তাই নয়, এখন ওটা যেন একটা পৃথক বাড়ি হয়ে উঠেছে। আগেকার চাইতে লম্বা হয়েছে ছাদ। আর তার নীচে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। ঘরের সামনে টানা বারান্দা। মেঝেও কাঠের। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি, তার উপরে কাঠের মেঝে।

এ রকম না করেই বা কী উপায়? এ অঞ্চলে শহরের সাহেবরা এলে এই ঘরের টানেই তো মহিষকুড়ায় আসে। থাকেও দু-একদিন করে! আগেও আসত, এখন বেড়েছে। এমন হয় যে মনে হবে, যেন শহরের কোর্ট বসে। এটাই চাউটিয়ার মত। চাউটিয়া, যে নাকি দু-একবার শহরের কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। আর ফুর্তিও হয়। ফুর্তি তখনই বেশি হয় যখন কোনো সাহেব থাকতে থাকতে জাফরুল্লার কোনো শালা-সম্বন্ধী আসে। বিশেষ করে মেজবিবির দরুন শালা। তার নিজেরই করাতকল একটা আছে। সেই যেবার সেই ম্যাজিস্টরকে হরিণের মাংস খাইয়েছিল। যাই বলো, ওটা কিন্তু

বে-আইনি, ওই হরিণ মারা। জাফরুল্লার শালা ম্যাজিস্টরকে সঙ্গে নিয়ে ধানখেতের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মেরেছিল হরিণ। আসফাক জেনেছিল পরে সাত্তারের কাছে। ছাল ছাড়িয়ে কাটাকুটি করে সেই মাংস দ্বারিঘরের রসুইখানায় কখন পৌঁছে দিল-তাও আসফাক জানত না, এমনকী ছমিরও না। পরের দিন ম্যাজিস্টর যখন তার জিপে উঠছে তখন এক টিন মাংস উঠতে দেখে আসফাক অবাক হয়েছিল। সে মাংস সেদিন জাফরুল্লার বাড়িতেও রান্না হয়েছিল! আসফাক খেয়ে থাকবে নিশ্চয়, কিন্তু মনে রাখবার মতো কোনো সোয়াদ পায়নি।

সবই তো চোখের উপরে ঘটে কিন্তু কোনো-কোনোটা এমন করে ঘটে যে মনে থেকে যায়। খাসি বলো, বকরি পাঁঠা বলো–সেসব জবাই করার ভার ছমিরের। মাস ছয়েক আগে শহর থেকে আট-দশ জনের এক দল এসেছিল। তারা এদিককার গ্রামগুলোতে মিটিন করে বেড়াচ্ছিল। লাঠির ডগায়, দুই লাঠির মধ্যে, লাল ফালি কাপড়, এসব নিয়ে চেঁচিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরল এবেলা ওবেলা। কী কাণ্ড! ছমির, সাত্তার, নসির, আসফাক, চাউটিয়া, মোটকথা জাফরুল্লার যত লোক, গ্রামের অন্য পাঁচজনও জানতে পারল, নাকি আইন হয়েছে প্রতিদিনের কাজের জন্য সাড়ে-আট টাকা করে পাওয়া যাবে। গ্রামের যত জমি দেখো, গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তার চাইতেও মজার কথা, গিরিগৃহস্থ আর আধিয়ার–এরা নাকি দুই জাত! তাদের মধ্যে গিরিরাই আধিয়ারদের সঙ্গে শত্রুতা করে। আর, যারা এসেছিল সকলেই নাকি এক জাত-আধিয়ারদের দলের তারা। অথচ চাউটিয়া বলেছিল, সেই দলে জাফরুল্লার বড়বিবির ভাতিজা খলিল ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিল না। অন্যদিকে আধিয়ারদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমান আছে, গিরিদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। হিন্দু আর মুসলমানে মারামারি এদিকে এই জঙ্গলে রাজ্যে, এমনকী এদিকের এই শহরে কোনো দিন হয় না। কিন্তু কোন হিন্দু বা কোন মুসলমান আছে যে দূরে দূরে শহরের সেইসব মারামারির গল্প শুনেছে? আর জাফরুল্লার ছোটবিবির ঘরেও এডিও যাতে গান হয়, খবর বাঁটে। শহরের সেই দলবেঁধে আসা ছোকরাবাবুদের একজনকে আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল ভয়ে ভয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, এদিকে আধিয়ার আর গিরিদের দলে মারামারি হতে পারে কি না। কলেজে পড়া সেই ছোকরাবাবু আসফাককে বুঝিয়েছিল সেটাই শেষ জিহাদ।

কিন্তু আসল কথা, সেই সেবার মাংস কাটা হয়েছিল দ্বারিঘরের কাছে। জাফরুল্লার গোরুর দলে দু-একটা ষাঁড় সবসময়েই থাকে। এ ষাঁড়টার মাত্র মাসতিনেক হয়, মাথার লোমা ছাড়িয়ে শিঙের মোচা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে, ঘটনার দিন তিন-চারেক আগে গাভীর দরুন পাকা ষাঁড়টার সঙ্গে গুঁতোগুতিও করেছে। ইতিমধ্যে দেড়-হাত পৌনে দু-হাত হয়েছে খাড়াইয়ে। আসফাক দেখল, গোরুর দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ছমির কিছু করছে। তারপর

দেখলে, একটা গাভীকে তাড়িয়ে আনছে সে দ্বারিঘরের দিকে, আর তার পিছন পিছন সেই নতুন, হরিণের রঙের ষাঁড়টা ছুটে আসছে। দ্বারিঘরের কাছাকাছি আসতে ছমির তার নিজের পিঠের দিকে কোমরে গোঁজা রশিটা হঠাৎ পরিয়ে দিল ষাঁড়টার গলায়। এখন, এই গোরুর দলের গলায় দড়ি পরানো তেমন হয় না। রাতে তারা খোঁয়াড়ে থাকে, সকালে খুলে ছাড়া হয়। দুধ দোয়ানোর সময়ে গাভীদের বাঁধা হয়। তামাকের খেতের লাঙলে বলদ জোড়া হয়, তখন তাদের গলায় দড়ি ওঠে। কিন্তু এঁড়ে ষাঁড়, বকনা এরা দড়ি চেনে না। কাজেই দড়ির বাঁধনে পড়তেই, বিশেষ সেই সুযোগে গাভীটা সরে যেতেই, ষাঁড়টা পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল। একবার তো ফেলেই দিল ছমিরকে হ্যাঁচকা টানে। উঠে ছমির এদিক-ওদিক চাইল, ততক্ষণে দ্বারিঘরের বারান্দা ভরে গেছে, যেন তারা এক খেলা দেখতে উৎসাহিত, সেই বাবুরা। বনের ছায়ায় ষাঁড়টাকে মদ্দা হরিণও ভাবা যায়। ছমির দেখলে, গাভীটা দ্বারিঘরের কাছে গাবগাছটার নীচে দাঁড়িয়েছে, ষাঁড়টাকে পিছনে নিয়ে আর একবার ছুটবার আগে। ছমির বুদ্ধি খুঁজে পেল যেন। হাতের দড়িতে ঢিল দিতেই ষাঁড়টা গাবগাছের দিকে ছুটল। এখানেই ছমিরের ওস্তাদি। ষাঁড়টা ছুটল গাছটার ডানদিকে, ছমির দৌড়াল বাঁদিকে। দড়িটা ছিঁড়ল না ষাঁড়টা, গলার দড়ির টানে বে-দম হয়ে জিভ বার করে থেমে গেল। এই খেলার এই যেন নিয়ম। ছমির দড়ি হাতে দৌড়ে গাছটাকে ঘুরে এল। ততক্ষণে গাভীটা পালিয়েছে, ষাঁড়টা গাছের গায়ে গলার দড়িতে বাঁধা পড়েছে। এইবার ছমির আরো ওস্তাদি দেখাল। ষাঁড়টা বুঝতে না বুঝতে তার হাতের দড়িটাতে ষাঁড়টার পিছনের পাদুটোকে পাকিয়ে নিয়ে গাছটার গোড়ায় টেনে বেঁধে দিল। আসফাক ভেবেছিল, এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে, এটা ছমিরের সেই কাজই, ষাঁড়টাকে খাসি করবে। এখন সময় নয়। ওটা শীতকালেই হয়। একটু অবাক লাগল আসফাকের। তারপরে সে স্থির করল, শহরের বাবুরা দেখতে চেয়েছে হয়তো। এটা খুব মজার ব্যাপারের মতো এখানকার লোকদেরও টানে। আর এটা হয়তো ছমিরের নতুন কায়দা। একাজে অন্য সময়ে পায়ে দড়ি বেঁধে, সেই পা বাঁশ দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে রাখার জন্য আরো দু-একজন লোক লাগে। এবার ছমির একাই কেরানি দেখাবে।

আসফাক তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এটা তার একটা দুর্বলতা। কিছুদিন থেকে এসময়ে সে পালায়। অন্য কাজের ছুতো থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও যতদুর সেই গরু-মোষের চিৎকার শোনা যাবে, তার বাইরে কোথাও গিয়ে বসে থাকে। কেমন যেন ভয় করে তার। তিনমাস আগে, সেই যে জাফর যখন তিনমাস খামারে ছিল না, তখন এক দুপুরে এক স্বপ্ন দেখেছিল আসফাক। যেন সে নিজেই একটা এঁড়ে মোষ। ছমির তার হাত-পা বেঁধেছে, বাঁশ দিয়ে উঁইয়ে চেপে ধরেছে আর তার সেই বিশেষ ছুরি নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে তার ঘুম ভেঙেছিল। সেই থেকে দুপুরে সে ঘুমোয় না, জাফর বাড়িতে না

থাকলেও। সেদিনও সে তাই করেছিল। জাফরুল্লার বাড়ির পিছন দিকে যে দহ, তার পারে সেই কুলগাছের নীচে সে ঘণ্টাখানেক পালিয়েছিল। কিন্তু এদিকেও তো তার কাজ। বাবুদের মধ্যে যারা দহে নেমে স্নান করবে না, তাদের জন্য জল যোগাতে হবে বাঁকে করে জল বয়ে।

প্রথম বাঁক জল নিয়ে এসে–একেবারে অবাক হয়েছিল সে। গাবগাছের একটা মোটা নীচু ডাল ছিল। তা থেকে একটা হরিণ যেন ঝুলছে। পিছনের পাদুটো ডালের গায়ে, মাথাটা মাটির কাছে। এগিয়ে এসে বুঝেছিল যে, এটা সেই ষাঁড়টাই। চামড়া ছুলছে ছমির।

বাবুরা চলে গেলে আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন ছমিরকে, অমন করি জবেহ করলু আড়িয়াটা!

অন্য কাজে ব্যস্ত ছমির বললে, করলং তো। কেমন যেন একটা সহানুভূতির মতো কিছু অনুভব করছিল আসফাক ষাঁড়টার জন্য। সে আবার বলল, কী ফায়দা? কাঁয় খায়?,

কেনে, ওই না ভোটবাবুর দল।

সহানুভূতি জাতীয় মনোভাব মানুষকে নানা কথা অহেতুক বলায়। আসফাক আবার বলল, উমরা না সগায় হিন্দু!

ছমির যা বললে তার সারমর্ম এই : ওরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু চারটে ঠ্যাং-ই ওদের ভোগে লেগেছে। মুসলমানরাই রান্না করেছে : ওরা তাদের সঙ্গে বসেই খেয়েছে।

অবশ্য আসফাক এই আধুনিকতার হেতু খুঁজে পায়নি, এমনকী একে আধুনিকতা বলেও বুঝতে পারেনি। জাত, ধর্ম কিছু নয়, তা ওরা বোঝাল।

এটা ছমিরের বৈশিষ্ট্য, ধান-চাল ছিটিয়ে মুরগি ধরা আর গাভীর ফাঁদে এঁড়ে ধরা জবেহর জন্য।

মৃদু মৃদু হাঁপাচ্ছে আসফাকের বুকের মধ্যে।

.

আসফাক উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলদগুলোর পিঠের উপর দিয়ে দিনের আলোর খোঁজ করছিল। আলো দেখতেই সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল যেন ঘুম থেকে। তার এই কেরানি ব্যর্থ হল, কারণ কেউ দেখল না। ছমির পর্যন্ত ধারেকাছে ছিল না। আসলে সে আদৌ ঘুমোয়নি, বরং তার রাত্রির আশ্রয় এই বলদের ঘরে সে ভোর-ভোর সময়ে এসে ঢুকেছে।

এই বড় চালাঘরটায় জাফরুল্লার ছ-জোড়া বাছাই করা বলদ থাকছে। আর এক পাশে এক মাচায় আসফাক। তাকে উঠতে দেখে বলদগুলো উঠে দাঁড়াল, গরু-মোষ দুই-ই। রাত্রির জড়তা কাটিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করল।

বাষ্পে ঘরটা ভরে গেল। আর তার মধ্যে দিয়ে মুখ বার করল আসফাক। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স হবে। রোগা লম্বাটে হলুদ হলুদ চেহারা, আর সকলের মতো কালো চেহারা নয়। চোখ দুটো টেরচা, উপরের পাতাদুটো বড় বলে মনে হয়। চিবুকে গোটা । দশ-পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ করছে।

সে যেন অবাক হয়েই চারিদিকে চাইতে লাগল। দ্বারিঘরের একটা জানালা খোলা। তার সামনে ধানমাড়াইয়ের ঘাস-চাঁছা মাটি। তার বাঁদিকে ধানের দুটো মরাই, আর ডানদিকে বলদদের ঘর, যে ঘরে আসফাক শোয়। ধানের মরাইয়ের পিছনে খড়ের মঠ আকাশের গায়ে ঠেকেছে। মঠের মাথায় শিমুলগাছের ডাগর ডালপালা। তার উপরে একটা পাখি বসে আছে ভোরের আকাশের মধ্যে। অত উঁচুতে পাখিটাকে ছোট দেখাচ্ছে। দ্বারিঘরের বিপরীত দিকে ধানমাড়াই আখড়ার অন্যপারে টিনের দেয়ালের টিনের ছাদের সেই ঘর যার একপাশে তামাকের গুদাম, অন্যদিকে প্রকাণ্ড সেই সিন্দুক-খাট যার উপরে দুপুরে ঘুমায় জাফরুল্লা। বিস্মিতের মতো এই সব দেখতে লাগল আসফাক। অথচ এমন পরিচিতই বা কী? সাত বছর হল। দশ হতে তিন বাদ।

এমন সময় খুক করে কাশল যেন কেউ। আসফাক চমকে উঠে, কাছিম যেমন খোলায় গলা ঢুকিয়ে নেয়, তেমন করে সরে গেল দরজা থেকে। জাফরুল্লার টিনের দেয়ালের দিনমানের শোয়া-বসার ঘরের দিকে চাইল সে। না, সেদিকে কোনো জানালা খোলা হয়নি।

বরং ছমিরই আসছে আবার।

তখন সে বুঝতে পারল, সারারাত ঘুমিয়ে এইমাত্র ওঠার যে অভিনয় করছিল সে নিজের কাছেই, দর্শক তো ছিল না, তার কোনো মানে হয় না। ছমির তো তাকে ফিরে আসতেই দেখেছে। হায়, হায় সে যতই চেষ্টা করুক, ছমিরের নিশ্চয়ই মনে থাকবে আসফাক সন্ধ্যায় না ফিরে রাত শেষ করে ফিরেছে।

ভোর-ভোর রাতের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল। দ্বারিঘর পর্যন্ত এসে সে তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে কোন সাহসে এগিয়েছে, তা যেন খুঁজেই পেল না। অন্ধকারের আড়াল ছিল বলেই বোধহয় সাহস।

এগোবে, না, পিছোবে–ভাবছে সে, এমন সময় কে একজন অন্দরের দিক থেকে বেরিয়ে এল-হাতে পাটকাঠির মশাল।

আসফাক যেন আলোর অনিবার্য টানে এগিয়ে গিয়েছিল।

কে? কাঁয়?

আসফাক।

আসফাক!

জে।

জে না। আমি ছমির। ফিরলু ত্যা?

একটা অবসন্নতায় আসফাকের শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল। টলতে টলতে সে বলদদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

এখন ছমির দ্বারিঘরের বারান্দায় উঠে তামাক সাজতে বসল। কী করবে এখন আসফাক? দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রোজ যেমন বলদগুলোকে খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তাই করবে?

এতে আর সন্দেহ নেই, এবারেও ব্যাপারটা বোকামিই হয়ে গিয়েছে। অথচ তখন সেটাকেই একমাত্র ঠিকঠাক বলে মনে হয়েছিল।

আর এ সবের জন্য সেই হাকিমবাবুই দায়ী। সরকারি কর্মচারী। রাজ বদলেছে। গল্পে শোনা সেই রানীর আমল তো ফিরবে না। তাই বলে সরকারি কর্মচারী তো সব বদলায় না। বিশেষ করে যার হাকিমের মতো পোশাক।

সেই হাকিমই দায়ী কিন্তু, এই স্থির করল আসফাক। জাফরুল্লার দ্বারিঘরে সে বসেছিল তার দপ্তর বিছিয়ে। গ্রামের অনেক লোকই যাওয়া-আসা করছিল। তাদের অনেক অভিযোগ কর্মচারীটি শুনছিল। কোনো কোনো সময়ে সে কাগজেও কিছু লিখে নিচ্ছিল! আর এসবই শুনতে পেরেছিল আসফাক দ্বারিঘরের বারান্দার নীচে বসে পাট থেকে সুতলি তৈরি করতে করতে। অবশেষে জাফরুল্লা খেতে গেল। তার অন্য চাকররাও তার পরে। চারিদিকে আর কেউ নেই। তখন এদিক ওদিক চেয়ে আসফাক হাকিমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নালিশ আছে। কঠিন নালিশ।

হাকিম বলল, কী চাও?

জে। আসফাক ঘরের আসবাব পর্যবেক্ষণ করল যেন।

কী দরকার, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

জে। আসফাক ঘরের ছাদ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

হাকিম চেয়ার থেকে উঠল। তখন তার বিশ্রামের সময়। সেই ঘরেই তার বিছানা পাতা। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিকের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে ব্যাপারির মতো ধনী কেউ নেই। টিনের ছাদ, কাঠের দেয়াল–এমন দ্বারিঘরই বা কার?

হাকিম সোজাপিঠের চেয়ার থেকে উঠে ঢালুপিঠের এক চেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। যেন ঘরে আর কেউ নেই। তারপর পাশ ফিরে আসফাককে দেখতে পেল।

কী, যাওনি? এখানেই চাকরি করো?

জে।

কত টাকা পাও? খেতে-পরতে দেয়? বলি, মাইনা-টাইনা পাচ্ছ তো?

না।

না?

হাকিম অবাক হল। কতদিন পাও না?

ছ-সাত মাস।

হাকিম হো হো করে হেসে উঠল। এই অদ্ভুত কথা শুনে আর আসফাককে দেখে তার খুব মজা লেগেছে সন্দেহ নেই। সে অবার জিজ্ঞাসা করল, কার চাকর?

জাফর ব্যাপারির।

জাফর কি খুব ধনী? তার কি অনেক জমি?

জে, জি বলতে বলতে আসফাকের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। নিজের বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্যও কম হয়নি। সে ভেবে উঠতেই পারল না, এমন একটা নালিশ সে কী করে সাজিয়ে-গুছিয়ে করতে পারল। কারণ হাকিমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার নালিশের কতটুকু উচ্চারণ করেছিল আর কতটুকু চিন্তা করেছিল, সে হিসাব রাখার পক্ষে অনেক উত্তেজিত ছিল তার মন। বরং যা উচ্চারণ করেনি, সে কথাগুলোই স্পষ্ট করে বলেছে, এমন অনুভব করছিল সে। নতুবা মাইনা কত, মাইনা সে পায় কিনা, এসব কিছুই নয়। নালিশ হল অব্যক্ত মনের কথা, অনেক কথা। প্রথমে সে দশবিঘা জমি পেয়েছিল চাষ করতে। কিন্তু সে জমিতে ধান ফলানো সহজ কথা? জংলা ভাঙা জমি। জাফরুল্লাকে ধানের ভাগ দিলে যা থাকবে, তাতে ছ-মাস চলা সম্ভব। জমির বিরুদ্ধেও তার নালিশ ছিল। জাফরুল্লা বরং তার খাওয়া-পরার ভার নিল। একটা জমি এখনো তার নামে আছে। এখনো ধান হয়। খাওয়া-পরার উপরে যে মাইনার কথা, মাইনার পরিমাণ, এসবই তো আসফাকের নিজেরই প্রস্তাব। হাকিমকে এসব কথাও কি সে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলেনি!

হাকিমের সম্মুখ থেকে চলে আসতে আসতে আসফাক নিজেকে অদ্ভুত রকম ভারমুক্ত মনে করেছিল। এসব নালিশ শুনলে গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা করতে পারে। গত সাতবছরে সে কি একবারও নালিশ করেছে? হাকিমও হেসেছে বলা যায়। তা হলেও–

কী অদ্ভুত কাণ্ড। দুপুরে আসফাক সেদিন খেতেই পারল না। তারও আগে ঝোরায় স্নান করতে গিয়ে উত্তেজনায় যেন তার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। স্নান করে ভিজে গায়েই খানিকটা সময় সে দুপুর রোদে ঝোরার পার ধরে ধরে

হেঁটেছিল। তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল তখন। হাকিমকে কিনা সব বলে দিয়েছে সে!

কিন্তু হঠাৎ তার গা ছমছম করে উঠেছিল। হাকিম সাহেব কি ব্যাপারিকে সব বলে দেবে? এতক্ষণে বলেও দিয়েছে হয়তো! তা হলে? আসফাক যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গি নিয়ে, নালিশ করার আগে যেমন পাটের সুতলি নিয়ে বসেছিল, তেমন করে আবার বসল।

আর তখনই মুন্নাফ এসে বলেছিল, তার আব্বাজানের জন্য ওষুধ আনতে হবে শহর থেকে।

ব্যাপারির বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়েছিল আসফাক। ওষুধ, যা কিনা মানুষের চূড়ান্ত বিপদের সময়ে দরকার হয়। ব্যাপারির বয়স হয়েছে, তিন-কুড়ির কম নয়। আজকাল কঠিন কঠিন অসুখ হয়। কয়েকমাস আগেই শহর থেকে ডাক্তার এসেছিল। যাওয়া-আসার জিপ ভাড়া ছাড়াও দুদিনে পাঁচশো টাকা নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার। তা, এমনটাই মানায় জাফরকে। এখনো আটশো বিঘা জমি তার যার চার-পাঁচশো বিঘাই একলপ্তে রিজার্ভ ফরেস্টের ধার ঘেঁষে। ওষুধ-যার অভাবে নাকি জাফরুল্লা মরতে পারে!

আসফাক তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করেছিল। বনের পথ সড়কের পথের অর্ধেক। সময়ও লাগে আধাআধি। অভ্যাসমতো কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন চলে গিয়েছিল। বনের পথ ধরেছিল সে। হঠাৎ একটা অস্বস্তির মতো কিছু মনে দেখা দিল। কিছু ভুলে গেলে যেমন হয়। তারপর সেই অস্বস্তিটাই যেন উষ্ণ হয়ে উঠল। তখন তার মনে পড়েছিল, হাকিমঘটিত ব্যাপারটা। যা সে করে ফেলেছে, তার তুলনা তার নিজের জীবনে নেই। কিন্তু ঠিক সে কথাই নয়। অন্য আরো কিছু, যা আরো উষ্ণ। এই চিন্তাগুলো যেন তার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছিল। তারপর কী হল, কে জানে!

যখন সে আবার পাকা রাস্তায় উঠেছিল, কিংবা বনের শেষে এমন এক পিচের রাস্তায় এসে পড়েছিল যার ওপারেও বন, তখন যেন সম্বিত পেয়ে পিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল ওপারের বনে না নেমে। তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। তারপর সন্ধ্যার পরে সে শহরের হাটখোলায় পৌঁছেছিল যেখানে ওষুধের দোকান।

তারপর ওষুধ নিয়েছিল সে। কিন্তু সোজাসুজি বনের পথ না ধরে সে পাকা। পথ ধরেছিল মহিষকুড়ার। সে নিজের কাছে যুক্তি দিয়েছিল–পথ তো পাকাই হওয়া উচিত, বনের পথ তো গ্রামের লোকের মনগড়া কিছু। সে পথে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেবারও যে ডাক্তার এসেছিল, সেও এই পাকা সড়ক ধরে।

কিন্তু এই জায়গাটার একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। বনের মধ্যে ও ব্যাপারটা কেমন হয়েছিল? অদ্ভুত বললে কিছু বলা হয় না। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? তার সারা শরীর ছমছম করে উঠল–ঘুম যদি হয়, তবে তার গায়ের পিরহান কোথায়? পাকা পথ হলেও তো অন্ধকার, আর দুপাশেই নিচ্ছিদ্র বন এখন। তখন আসফাক স্থির করছিল, সাহস করে চলতে হবে। ভয় পেলেই খারাপ।

আর এখন, এই দিনের বেলায়, একটা ব্যাপারই পরিষ্কার, আসফাক দেরি করে ফেলেছে। কাল সন্ধ্যার মধ্যে যার ফেরার কথা ছিল, সে ওষুধ নিয়ে ফিরেছে রাত ভোর করে। কাজের ভার নিয়ে এমন দেরি সে করতে পারে–এ তার সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় না। ফিরেই তো আসতে হয়েছে, তবে সেসব বোকামি করার কি প্রকার ছিল? ওষুধ–যার দেরি হলে মানুষ মরে!

আসলে হাকিমের সামনে নালিশ করতে যাওয়াই যত গোলমালের মূল।

.

সেই সেবারের কথা। ব্যাপারটা ঘটবে আগেই জানা ছিল। অনেকেই বলেছিল তাকে। সংসারে থাকার মধ্যে ছিল তার বাপ। মায়ের বয়স অনেক হয়েছিল। চুলগুলো শনের নুড়ি, চোখেও ঝাপসা দেখত। কাজেই তার মৃত্যু ধরে নেয়ার মতো ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু তার বাপ তুলনায় জোয়ানই ছিল বলতে হয়। অথচ মায়ের মৃত্যুর মাস কয়েকের মধ্যে তারও মৃত্যু হল। তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল, অঘটন কিছু ঘটবেই। বাড়ি বলতে একখানা খড়-পচা পুরনো চৌরি ঘর, যার বারান্দায় রান্না হত। অন্য একটা ঘর ছিল যার বেড়া ছিল ফাটানো বাঁশের, আর ছাদ ছিল খড়ের। এই ঘরে থাকত একটা নড়বড়ে মই আর মরচে ধরা একটা লাঙল। কিছু দড়িদড়া থাকত। অন্যদিকে থাকত একটা বুড়ো বলদ যার কাঁধে একটা পাকাঁপোক্ত রকমের ঘা ছিল। ছবিঘা জমি চষত আসফাকের বাপ। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পরই আসফাক শুনতে পাচ্ছিল, এবার নতুন আধিয়ার আসবে। এই ছবিঘা জমিতে সে সোনা ফলাবে। ও আর আসফাকের কর্ম নয়। কী বলিস আসফাক? দশজনের মুখে শুনে সে বলত–হেঁ। কাজেই খড়ের সেই চৌরিখানা যে ছাড়তে হবে, এ বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ হল। কিন্তু এত জেনেও কী হল? সেই একদিন সকালে সেই নতুন চাষি যখন বাড়ি দখল নিতে এল, তখন কার কাছ থেকে দখল নেবে, তা খুঁজে পেল না। কারণ গোয়ালঘরের চালার নীচে পাট, তামাক রাখার জন্য আসফাকের বাবা যে বাঁশের টোং-মাচা বেঁধেছিল, সেখানে লুকিয়ে আসফাক তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। কে যেন বলছে, দূরে যাও, আড়ালে যাও, এখানে কিছু নেই। চোখ বন্ধ করে সে সেখানে পড়েছিল একটা দিন, একটা রাত্রি। অথচ কী ছিল ভয়ের? নতুন বর্গাদার তো আদালতের পেয়াদা নয়, পুলিশও নয়।

আসফাক এখন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। নিজের বুকের দিকে চোখ নামাল সে। কেমন যেন গরম লাগছে সেখানে। হাত দিয়ে মুছে দিল একবার। পরে সে বুঝতে পারে, কিন্তু যখন বোঝা দরকার তখন যেন সব গুলিয়ে যায়।

এখন ছমিরের মনোভাবটা বোঝা দরকার। তার দেরি করার ফলে তো কিছু ঘটবেই। এসব ব্যাপারে চুপচাপ মেনে নেয়ার লোক নয় জাফরুল্লা। তার দেরি দেখে নিশ্চয়ই জাফরুল্লা সন্ধ্যায়, রাত্রিতে খোঁজখবর নিয়েছে। ছমির, নসির, সাত্তার এদের সঙ্গে আলাপও করেছে। সুতরাং ছমিরের কাছে বোঝা যাবে।

সে ছমিরের দিকে এগোচ্ছিল, পিছিয়ে আসতে হল তাকে। জাফরুল্লার শোবার ঘরের এদিকের জানালাটা খুলছে। ওই জানালায় এখনই জাফরুল্লার। মুখটা দেখা যাবে আর বাজ-ঠাটার মতো গর্জন শোনা যাবে : আসফাক, এই বেইমান।

জানালাটা খুলল কিন্তু কিছুই ঘটল না। এমন বিস্ময় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না–এই কিছু না ঘটা। এতক্ষণে যেন বেলাটাও নজরে পড়ল। তা এতক্ষণে জাফরুল্লার দুছিলিম তামাক পুড়ে যায়। আসফাককেই তা দিতে হয়। সে না থাকলে ছমির দেবে। কিন্তু দেখো ছিলিম ধরিয়ে নিজেই মজা করে টানছে ছমির। তাও এমন জায়গায় বসে যে জাফরুল্লার জানালা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা।

তা হলে? তা হলে কি ব্যারামের মুখে ওষুধ না পেয়ে জাফরুল্লা–বাক্যটাকে চিন্তাতেও শেষ করতে পারল না সে। স্তম্ভিত আসফাক তার চিবুকের যেখানে সেই ছ-সাতটা লোমা দাড়ির কাজ করে, সেখানে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তার দেরি করার এই ফল দেখে। সে জাফরুল্লার ঘরের খোলা নিঃশব্দ জানালার দিকে চাইল আর তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল। তা হলে দেরি বলে আখেরি দেরি করেছে সে!

ইতিমধ্যে ছমির কলকেটা শেষ করে মাটিতে উপুড় করল। দুহাত জড়ো করে মটমট করে আঙুল ফোঁটাল। আবার নতুন করে ছিলিম ধরাল। এইবার আসফাক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছমিরের দিকে।

মৃদুস্বরে সে বলল, তা, ছমির, ব্যাপারি?

ধোঁয়ায় মুখ বন্ধ ছমিরের। আরো দু-টান দিয়ে ছিলিমটা সে আসফাককে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ব্যাপারি শহরে। ছমির চলেও গেল।

আসফাক বসে পড়ল। অবসন্নতায় তার শরীর যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাত্রিতে ঘুম হয়নি। কাল দুপুর থেকে খাওয়া হয়নি। বনের সেই ব্যাপার, পথের সেই ধকল। আর ভয়, যা এইমাত্র একটা চূড়ান্ত ধাক্কা দিল তাকে।

কিন্তু এটার ভালো দিকও আছে। খানিকটা সময় তো পাওয়া গেল। বসে থাকতে থাকতে এই বুদ্ধি এল আসফাকের মাথায়। বুদ্ধিটাকে আর একটু পাকা করে নেয়ার জন্য নতুন করে ছিলিম ধরিয়ে নিল সে। অবশেষে স্থির করল, ছমির বা অন্য কোনো চাকর হয়তো এখনো ব্যাপারটা সবটুকু বোঝেনি। সময় মতো ফিরে, তা রাত হয়েছিল ফিরতে, বনে পথ হারিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল–এটাকে কৈফিয়ত হিসাবে দাঁড় করানো যায় কি না দেখতে হবে। দেরি করেনি সে ইচ্ছা করে, এটাই প্রমাণ করা দরকার।

রোজকার মতো কাজ শুরু করল সে। সেটাই কৌশল হিসাবে ভালো হবে। বলদগুলোকে ছেড়ে দিল। অন্যান্য দিনের মতো হেইহই করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। না তাড়ালে খড়ের মঠে মুখ দিয়ে পড়বে।

খামার থেকে কিছুদূরে একচিলতে বন আছে। একচিলতেই বটে, পঞ্চাশ-ষাটটা শালের গাছ। এই বনের পাশ দিয়ে ঝোরা। ঝোরার ওপারে কাশের ঝোপ একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। ঝোরায় এখানে একহাঁটু জল। এপার থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওপারে গিয়ে পড়ে। কিন্তু স্রোত আছে। আরো পশ্চিমে এর জল স্বচ্ছ। পাথরকুচি মিশানো বালির খাত-অনেকটা চওড়া কিন্তু শুকনো। ঝোরা সেখানে অনেকগুলো ধারায় তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আসফাক, সেখান থেকে সিকি মাইল গেলে ব্যাপারির দহ-জাফরুল্লার নাম থেকেই নাম। সেখানে জল বেশ গভীর। জলের রং প্রায় নীল। আর তার উপরেই জাফরুল্লার খামারবাড়ি।

এখানেও, এই বনের মধ্যে ডুবে থাকা জমিও জাফরুল্লার। আসল বনের সীমার বাইরে এই বনটা কী করে হল? চাউটিয়া ছমিরকে বলেছিল, আর তখন আসফাক শুনেছিল, বনটার দোষ নয়। জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন, তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হল। কোন আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে? সেইবার সেটেলমেন্ট হল। আর তখন সেই এক কানুনগো এসেছিল। জাফরুল্লার বাবা ফয়েজুল্লার সঙ্গে তার ফিসফাস ফুসফাস ছিল। এখানে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চাষের জমি বলে লিখিয়ে কী সব করে গিয়েছে। এখন এই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে জট খোলা কঠিন। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এদিকে কোথায় বন, কোথায় তার সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি, কেউ জানত না। একবার বন এগোত, একবার চাষের খেত। বনই পিছিয়ে যেত বেশির ভাগ।

নদী, চাষের খেত এবং বন সম্বন্ধে এই সব দার্শনিক চিন্তা শেষ করে আসফাক আবার খামারের দিকে ফিরল।

তার তখন মনে হল, যাই হোক, ছমির কী ভাবছে, তা এখনো বোঝা যায়নি। এটা মনে হতেই তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। জাফরুল্লা মরেনি, তার দেরি করাতেও বেঁচে আছে। সে নিজের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ

খামারবাড়িকে লক্ষ করতে লাগল। কেউ যেন সাড়া দেয় না, অন্য চাকরগুলোই বা গেল কোথায়!

বলদগুলোর ঘরটা এখনো সাফ করা হয়নি। আসফাক ফিরে গিয়ে ঝুড়ি করে গোবর ফেলতে শুরু করল। যেখানে-সেখানে ফেললে চলবে না। হয় খামারের পিছনের উঁইতে কিংবা তামাকের খেতে। অন্যদিনের চাইতে বেশি মন দিয়ে করলেও ঘরটা সাফ করতে বেশি সময় লাগল না। এর পরে গাভীদের আড়গড়াতেও ওই একই কাজ! কিন্তু ঘণ্টাখানেক ধরে একাজটা শেষ করেই আবার তার মনে হল : আশ্চর্য, ছমির নিজে থেকে কিছুই বলছে না! সকলেই তার থেকে দূরে থাকছে।

খানিকটা ভেবে সে স্থির করল, হয়তো ছমিররা সকলেই কোনো চাষের কাজে গিয়েছে। কী চাষ হবে এই বৃষ্টি না হওয়ার দিনে, তা সে বুঝতে পারছে না। দ্বারিঘরের বারান্দা থেকে ছিলিম নিল আসফাক, বড় একদলা তামাক। খড়ের নুড়ো পাকানো ছিল। তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে সে চাষিদের খোঁজে বেরোল।

খামারবাড়ির পিছন দিকে দহের ধার ঘেঁষে একটা জমিতে চাষ দিচ্ছে বটে কয়েকজন কৃষাণ। জল-বৃষ্টি নেই অথচ জমিটা যেন জলে টইটম্বুর। তা বোঝা যাচ্ছে উপায়। দহের ধারে খুঁটি আর খুঁটি থেকে ঝোলানো নৌকা। নৌকাকে চেঁকির মতো চালিয়ে দহের জল খেতে চালান দিয়েছে। . সেখানে পৌঁছে আলের উপরে বসে ছিলিম ভরল আসফাক। নুড়ো ভেঙে সেই ছাইয়ে তামাকে আগুন ধরাতে হঠাৎ তার মনে পড়ল–এই আট-দশ বিঘা জমিটা তাকে চষতে দিয়েছিল জাফরুল্লা। তার নামেই আছে এখনো। সে ঠিক দুরস্ত করতে পারেনি জমি। তারপর এক সময়ে এটাকেই ভোগধানের জন্য পছন্দ করে জাফরুল্লা। তা সেই সুগন্ধ ভোগধান লাগেই তো–জাফরুল্লার নিজের খোরাকি, দ্বারিঘরে যারা আসে সেই সাহেবদের পলাউ। তিনটে হাল চলছে। ছমির ছাড়া আরো দুজন। নসির আর সাত্তার।

আসফাককে তামাকের যোগাড় করতে দেখে এক-একজন করে কৃষাণ আসতে লাগল হাল ছেড়ে। সব শেষে ছমির এল। আর তাকে দেখে ছিলিম নতুন করে ভরল আসফাক। ছমিরের হাতে ছিলিম তুলে দিয়ে নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছমির নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল।

অবশেষে আসফাকই বলল, কেন, কাল রোয়া গাড়েন?

না তো কী?

আর কায়ও চাষ দেয় না কিন্তুক। জল-ঝরি নাই।

ছমির ছিলিমটা আসফাককে ফিরিয়ে দিল।

কেন, ছমির—

কী?

না। তাই কং।

ছমির আল থেকে নেমে লাঙল ধরল। চাষিদের পা কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বলদগুলোরও সেই অবস্থা। দহের জল যেন দহ ছেড়ে উথলে এসেছে জাফরুল্লার হুকুমে।

কিন্তু ছমির এবারও কথা বলল না। তাহলে? তার দেরি করে ফেরার ব্যাপারটা জেনেশুনেও দম মেরে আছে। ব্যাপারি ফিরলে লাগাবে সাতখানা করে। শুধু দেরি নয়, ওষুধ যা নাকি মানুষের জীবন বাঁচাবে, তা আনতে গিয়ে দেরি করা!

আসফাকের হাতে তামাকটা বৃথা পুড়তে লাগল। লাগাবেই বা কী ছমির? ব্যাপারি শহরে যাওয়ার আগে কি জেনে যায়নি নিজেই?

হঠাৎ কথাটা মনে এল। সে কি ইতিমধ্যেই এদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছে? সে একটা গল্প জানে : দাগি আসামিদের নাকি এরকম হয়। তার নিজের গ্রামের লোকেরাও কথা বলে না। বললেও তা না বলার শামিল। অথচ দেখো, ওরা একই রেখায় হাল চালাতে চালাতে কথা বলছে। সাত্তার হাসলও যেন একবার। আসফাক কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে সে ওদের আলাপের পরিধিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াল যেন, কিন্তু কেউই ওকে আমলে আনছে না।

হ্যাঁ, দেরি তো হয়েছে, শহরে পৌঁছে যেখান থেকে ওষুধের দোকান দেখা যায়, সেখানে এক গাছতলায় বসে পড়েছিল আসফাক। তখন কে যেন বলেছিল : ওষুধ বলে কথা। ওঠো, দেরি হয়। আসফাক তা শুনে হাঁফাতে লাগল। যেন বলবে : তাই বলে মানুষ কি জিরাবে না! অবশেষে ওষুধ নিয়েছিল। ফিরবার পথে সে পাকা পিচের পথে এসে তারপর গোরু-গাড়ির পথ ধরে এসেছে। অর্থাৎ বনের পথে সোজা আসেনি। দোষ কী বলো? বনের পথ তো আর পথ নয়, গ্রামের মানুষের মনগড়া কিছু। আর তাছাড়া অত রাতে বনে ঢুকলে কি পথ বোঝা যায়? পিচের পথে খানিক দূর এসে তার মনে হয়েছিল বনের পথে ঢোকার কথা, কিন্তু পিচের পথের দুধারে তখন বনের অন্ধকার। তার ভয় করেছিল। সে অন্ধকার যেন আতঙ্কের মতো কিছু।

অবশেষে সে নিজে থেকেই বলল, বোঝো কেনে।

ওরা যেন শুনতেই পেল না।

দ্বিতীয়বারও সে প্রায় চিৎকার করে বলল, বোঝো কেনে।

লাঙলের পাকে সাত্তরই কাছে এসেছিল। সে বলল, কও।

আসফাক বলল, কাল ভুলুয়া না কী কয় তাই লাগছিল।

সাত্তার হাল ধরে ততক্ষণে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকেই বলল, তা লাগে অনেক সময়।

আসফাক বলল, সাঁঝ থাকি দুইপর রাত। শেষৎ দেখি শালমারির বনৎ চলি গেইছি।

এবার নসির দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুলুয়া অপদেবতা। যে নাকি মানুষের পথ ভুলিয়ে দেয়, তেমন হলে দহের জলে ডুবিয়ে মারে। নসিরের বয়স হয়েছে।

শুনে সে অবাকও হল। সে বলল, শোনেক সাত্তার। আসফাক কয়, ভুলুয়া ধরছে। পাছৎ কোটে গেইছিস আসফাক?

শহর।

শহর? নসির কথাটা যেন ভাল করে জেনে নিল।

শহর? সাত্তার বলল, ও সেই ব্যাপারির ওষুধখান।

আসফাকের বুকের মধ্যে ধকধক করে উঠল। জানে, এরা সকলেই জানে তা হলে দেরি হওয়ার কথা।

সাত্তার বলল, তা আসফাক, ভুলুয়া ধরলে বসি যাওয়া লাগে। হাঁটা লাগে না।

নসির বলল, বুঝলা সাত্তার, আমার বড়চাচাক্ একবার ভুলুয়া ধরছিল।

নসির আর কী বলল, আসফাক তা শুনতে পেল না। কারণ প্রথমে সাত্তার, তার পিছনে নসির, সবশেষে ছমির হালের পিছন পিছন আবার দূরে চলে গেল গল্প করতে করতে। ভুলুয়া লাগার গল্পই। দূর থেকে আসফাক দেখতে পেল, ওরা যেন হাসছেও। বিমর্ষ মনে সে ভাবল, ওরা বিশ্বাস করেনি। মিথ্যাটাকে ধরে ফেলেছে।

হঠাৎ আসফাক উঠে দাঁড়াল। কী সর্বনাশই সে করে ফেলেছে। সাত্তার আর নসির হয়তো জানত না তার দেরি করে ফেরার কথা। তারাও এখন জেনে ফেলল।

কী করবে এখন সে? কোথায় যাবে?

নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সে তামাকের খেতগুলোর কাছে এসে পড়েছে। যতদূর চোখ যায়, একখানা বাদামি কাগ যেন বিছানো আর তার। উপরে সমান দূরে দূরে সবুজের ছোপ। কিন্তু এখানে কেন এল সে? এখানে কী কাজ আছে? কথাটা চিন্তায় ফুটে ওঠার আগেই আবেগটা দেখা দিল। এই তামাকের খেতে কাজ করতে গিয়েই জাফরুল্লার কাছে থাপ্পড় খেয়েছিল আসফাক একদিন।

আলের উপরে বসল আসফাক। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথা কাত করে কানটাকে সে চেপে ধরল কাঁধের উপরে যেন শব্দটাকে থামাতে। চেষ্টা করে সান্ত্বনার মতো একটা চিন্তা নিজের মনে ফুটিয়ে তুলল সে। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে–তা, সে বোধহয় না খেয়ে থাকার জন্য। কাল দুপুর থেকে খাওয়া হয়নি তার।

তামাকের খেতেও খুঁটিনাটি লক্ষ করতে লাগল সে। তা এটা দেখার মতো কিছু বটে। তাকিয়ে দেখো, যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখো-একটা ঢিল দেখতে পাবে না কিংবা একটা ঘাস। এমন জমি আর জীবনে দেখা যাবে না। যে জমিতে গোবরসার দেয়ার জন্যই দু-কুড়ি গরুবাছুর আছে জাফরের। গর্ব করার মতো কিছু বটে। আসফাকের কৃষকমনে অকৃত্রিম প্রশংসার ভাবটাই দেখা দিল। সে এ জমির কাজ কিছুই শিখতে পারেনি। কজনেই বা তা জানে! আর সেই কিনা। গিয়েছিল তামাকের পাতা ঝরতে! জল দেয়ার জন্য দহের মধ্যে যে টিউবকল, বসে তা পাম্প করো–আচ্ছা! জমির ঘাস তোলো একটা একটা করে খুঁটে, তাও খুব। কিন্তু পাতা ঝোরা? জাফর নিজে ছাতা মাথায় অষ্টপ্রহর দাঁড়িয়ে থাকে, পাতা ঝোরায়। আসফাক তাদের দেখাদেখি দা হাতে করে একটা গাছে কোপ দিতেই ছুটে এসে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল জাফর। স্বীকার করতেই হবে, বুদ্ধি আছে জাফরের। সেই হেঁউতির খেতটা ভাবো। আর কেউ কি ভাবতে পারে ডোঙা দিয়ে জল ছেচে এই বৃষ্টি না-হওয়া দিনে হেঁউতির জমি তৈরি করতে? আল্লা পানি দেয় না, জাফর ডরায় না। আটশো বিঘা জমি এখনো তার। নতুন। আইনে দুশো বিঘা বনকে ফিরিয়ে দিয়েই নাকি এই। তখন ব্যাপারির বাড়িতে গোলমাল লেগেছিল বটে। তা জাফর সে সব কাটিয়ে উঠল। চার বিবি তার, এক ছেলে। সকলের নামে জমি লিখে দিল সে। একেবারে এজেষ্ট্রি করে। শেষে বাড়ির পাঁচজন চাকরের নামে। আসফাকের নামেও জমি লেখা হয়েছিল তখন। তারপর জাফর সকলকেই একশো টাকা করে নগদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার রেহানিখত লিখিয়ে সে সব জমি নিজের তবে এনেছে। নিজের জমি অন্যকে লিখে দিয়ে মিথ্যা ঋণের রেহানিখতে আবার সে জমিকে নিজের হাতে আনা। বুদ্ধি আছে বটে। সেই জমিতে ধান হয় আর তামাক।

আসফাক যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই সে,ছমিরদের আবার দেখতে পেল। তাদের একজন ছিলিম ধরাতে বসল। আর দুজন গেল দহের দিকে। স্নান করবে নাকি?

কিন্তু এসব সে ভাবছে কেন?

[আসফাক বুঝতে পারল না, তার মন চারিদিকের এই সব টুকরো ব্যাপার দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।]

দু-তিনটে আল পার হলেই সেই আল যেখানে ওদের তিনজনের একজন ছিলিম ধরাতে বসেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আসফাকের মনে হল, ও যদি ছমির না হয়ে সাত্তার কিংবা নসির হয়, তবে কিছু খবর নেয়া যায় ওর কাছে। এটা ছমিরকে জিজ্ঞাসা করা যেত। কিন্তু সকাল থেকেই ছমিরকে তার ভয় করছে।

সে যেখানে বসেছিল, তার কিছু দূরে এক টুকরো জমি। দূর থেকে বাতাসে দোলা গাছগুলো দেখলে মনে হবে ধান। কিন্তু আউশ নয়। ছম। ঘর ছাওয়ার ছন। কচি অবস্থায় বলদ খায়। বেশি খেলে সহ্য হয় না। কিন্তু মোষ ছাড়ে না। বরং ভালোবাসে। আগে মহিষকুড়ায় যখন মহিষের আচ্ছা, তখন সব দহের পার ধরে শুধু এই ছনেরই জঙ্গল ছিল। আর সেজন্যই তারা আসত।

হঠাৎ ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। প্রথমে এই জমিটাই চষতে দিয়েছিল তাকে জাফরুল্লা। তিন বছর প্রাণপাত করেছিল আসফাক। কিন্তু দশ বিঘায় আট-ন-মণ ফললে খুব। চার বছর হল ওই জমি ছেড়েছে সে।

তারপর–তখন একদিন খুব ভোরে, সেদিন মনটা খুব ভাল ছিল জাফরের, দ্বারিঘরে সে এসে বসতেই তার হুঁকায় ছিলিম বসিয়ে দিয়েছিল আসফাক। হুঁকায় কয়েকটান দিয়েই জাফর বলেছিল, তা আসফাক, দহের ধারে ওই দশ বিঘা জমি তোমাকে দিলাম। মনৎ ঠিক রাখিস। যেন এক কৃতজ্ঞতার দান, যেন কেউ পরামর্শ দিয়েছে, আর তা মানতে পেরে জাফর খুশি। সেই জমিতে আজ রোয়ার জোগাড় করা হচ্ছে।

এটা অন্য জমি বন্দোবস্তের মতো ব্যাপার নয়। এর জন্য কোনো দলিল হয়নি, কোনো রেহানের কাগজে টিপ দিতে হয়নি। কিন্তু জমিটার নাম হয়েছে। আসফাকের ভূঁই।

কিন্তু তার চিন্তা ঘুরে গেল। জাফরুল্লা কখন গেল, কী অবস্থায় গেল, কখন ফিরবে, এসব ভাবতে ভাবতেই এদিকে মন চলে এসেছিল। দেখাই যাচ্ছে ও ছমির নয়। সাত্তার। এখনই ওর কাছে জেনে নেয়া দরকার ব্যাপারির কথা।

কথা বলার আগে আসফাক হাসল খুঁতখুঁত করে।

সাত্তার বলল, ছিলিম?

আসফাক হাত বাড়াল। ছিলিমটা দিল সাত্তার।

সাত্তার বলল, পিঁপড়া চলে, ঝরি হবার পায়।

আসফাক বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে কাশল। ছিলিমটা সাত্তারের হাতে ফিরিয়ে দিল।

তো হেঁউতির চাষ আগুই হইবে মনৎ খায়। বলল সাত্তার।

আসফাক কথা না বলে অ্যাও-অ্যাও করল।

সাত্তার জিজ্ঞাসা করল, কী বলির চাও, সেই ভুলুয়া?

আসফাক গড়গড় করে হাসল। বলল, ব্যাপারি যেলা গেইছে, দেখছ?

সাত্তার বলল, সে নিশ্চয় দেখেছে। ব্যাপারি সেই হাকিমের সঙ্গে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর ভঁকভঁকি এসেছিল তার। সেই গাড়িতে ব্যাপারি গেল তার সঙ্গে আর মুন্নাফও গিয়েছে। হাকিমই পীড়াপীড়ি করে নিয়ে গেল।

অ।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল আসফাকের। তারপর সে হাসল আবার। ভারমুক্ত বোধ হল যেন হঠাৎ নিজেকে। সে জোরে জোরে হেসে উঠল দ্বিতীয়বার। তা হলে ব্যাপারি ওষুধের জন্য অপেক্ষা করে থেকে তার দেরিকে আন্দাজ করতে পারেনি!

সাত্তার বলল, সে ভুলুয়ার কথা যা বলেছে তা মিথ্যা নয়। তার বড়চাচা সব আইন জানত। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে যখন ক্লান্ত, তখন সে বুঝতে পেরেছিল, ভুলুয়া ধরেছে। পিরহান খুলে ফেলে, কাপড় ঝেড়ে, পরে বগলের তলা দিয়ে চেয়ে সে আবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু বগলের তলা দিয়ে চাইতে গিয়ে সে ভুল করে ফেলেছিল। কারণ সে একজনকে। দেখে ফেলেছিল, যার চোখদুটো রক্তের মতো লাল। মোটরগাড়ির পিছনের আলোর মতো আর তার মাথায় শিং। বাড়িতে ফিরে বড়চাচা প্রাণে বাঁচল, কিন্তু মাথায় দোষ হয়ে গেল।

ছিলিমটা সাত্তরের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসফাক। নিঃশব্দে সে হাঁটতে : শুরু করল। এ সব ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে আলে উঠে ধরানো ছিলিমে টান দিয়ে আবার কাজের দিকে ফিরে যাওয়াই প্রথা। বিদায় দেয়া-নেয়ার প্রথা নেই।

একটু যেন ভয়-ভয় করল আসফাকের। সাত্তারের বড়চাচার সেই ভুলুয়া কি দেখতে মোষের মতো ছিল নাকি? কিন্তু মানুষ যেমন করে কাজে যায়, তেমন করে বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটতে শুরু করল, যেন একটা সরকারি কাজ মনে পড়েছে। সেই ভঙ্গিতে চলতে চলতেই সে যেখানে বলদগুলোকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এটার পিঠ চাপড়াল, ওটাকে ধাক্কা দিয়ে রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরিয়ে দিল। যেন সব কয়েকটি ঠিকঠাক খাচ্ছে কি দেখল। তারপরই একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল।

দেখো কাণ্ড! হাকিম জাফরুল্লার মিতা। আর তার কাছে কিনা নালিশ জাফরুল্লার নামে!

কাল রাতে ঘুম হয়নি। তার উপরে সে সকাল থেকে কাজ করছে। কাল দিন-রাতে একবারও খাওয়া হয়নি। এখন আজকের খাওয়ার সময়ও গড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে সে বসেছিল, সেখানে বাতাস চলছিল। ক্লান্তি, অবসন্নতা, ক্ষুধায় ঝিমুনির মতো লাগল তার। আর তার মধ্যে দিয়ে যেন

এই খামারে তার নিজের অবস্থিতির কথা ঠান্ডা-ঠান্ডা হয়ে মনে হতে লাগল। কেমন একটা ঔদাস্য ভর করল তাকে।

.

সাত সাল হল তার এই খামারে। এককুড়ির কম ছিল বয়স তখন। আঠারো-উনিশ হতে পারে। এখানে পৌঁছানোর পরই সব যেন এক সাজানোগোছানো বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বুধাই রায়ের খামার ছাড়ার মাস চার-পাঁচ পরেই হবে।

আর এখানে সে খারাপই বা কী আছে? দুবেলা খেতে পায় সে। পরিশ্রমও বেশি নয়। ধরতে গেলে ধীরে ধীরে জাফর তাকে অন্য চাকরদের থেকে একটু পৃথক করেই দেখে, সেই থাপ্পড়ের ঘটনাটা ঘটলেও। তামাকের খেতের কঠিন কাজে তাকে যেতে হয় না। ধানের খেতে বেচাল বর্ষায় ঘাস হলে নিড়ানি নিয়ে বসতে হয়। বলদ, মোষ, গরু দেখাশোনা, রাখালদের খবরদারি করা, দড়ি পাকানো, তামাক বানানো, বাজারসওদা করা–এসবই তার কাজের ফিরিস্তি। বড় জোর চাউটিয়াকে উনি টেনে সাহায্য করা। তা সেটা বর্ষার পরে শীত আসার সময়ে, যখন দুধে মাখন বেশি হয়।

আর এছাড়াও প্রমাণ আছে। তিন সালের পুরনো হল ব্যাপারটা। জমি নিয়ে কাজিয়া। যদিও জাফরের বাড়ির অধিকাংশই তখন সাদা। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, সঙ্গে সঙ্গে চাকর-তাধিয়ার মিলে আট-দশ জনকে। মানুষ নাকি খুন হয়া গেইছে।

সে যখন যাচ্ছে আসফাককে ডেকে বলেছিল : আসফাক, বাপজান, ইদিক শোনেক। সব দেখি-শুনি রাখবা, কেমন? আসফাক বড় ভালো ছাওয়াল।

জাফরুল্লার চার বিবি তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ফোঁতফোঁত করছে। তখন জাফরুল্লা ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যারা ধরা পড়েছে, পুলিশের ঘেরের মধ্যে দ্বারিঘরের বারান্দায় যারা বসেছিল, তাদের নাম করে করে প্রত্যেককে সাতবিঘা চাকরান দেয়ার কথা বলেছিল। যার যেখানে বাস তার চারিদিকে ছ-সাতবিঘা করে চাকরান। লেখাজোখা নাই। কিন্তু বড়বিবিকে বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে, অন্য তিন বিবিকে সাক্ষী রেখে বন্দোবস্ত ঠিক করেছিল। আর, তারপরে, বলেছিল দহের ধারে নাবলা দশ বিঘা আসফাকের। বলেছিল, মুই যেদু না ফিরির পাং, তো ওই জমি আসফাকের থাকি যাইবে।

কথার ভাব শুনে মনে হয়, জাফরুল্লা ধরে নিয়েছিল, সে আর ফিরবে না। বলেছিল, আমার যদি ফেরা না হয় সবই মুন্নাফের। চার বিবি সব দেখে রাখবা, কেমন। আর আসফাক সকলেক দেখবা, আসফাক, বাপজান।

এই শুনে, তাকে নিয়ে যেতে দেখে, আর জাফরের চার বিবি আর মুন্নাফের কান্নার সামনে আসফাকের চোখে জল এসেছিল। জাফরুল্লা প্রায় তিনমাস পরে ফিরেছিল। কিন্তু কথা ফিরিয়ে নেয়নি। সেই চাকর-আধিয়াররা– ছমির,

নসির, সাত্তার, চাউটিয়া, দুপরু, ঠেংঠেঙ্গা, যে যখন ফিরেছে, তারাই সে চাকরান ভোগ করেছে। দহের ধারের সেই দশবিঘা এখনো আসফাকের ভূঁই।

আর জাফর যখন অনুপস্থিত, তখন আসফাক কী না করেছে? ধান-তামাকের খেতখন দেখাশোনা তো বটেই, জাফরের বিবিদের তদবির-তদারক। আর বলদ গরু মোষ, যা তার আসল জিম্মি, তাদের চেহারা তেমন কোনোদিনই আর হবে না, সেই তিন মাসের যত্নে যা হয়েছিল। সেই সময়ে মুন্নাফ কথা বলতে শিখছিল। তখন তাকে কেউ শিখিয়ে দিয়ে থাকবে। সেই থেকে মুন্নাফ তাকে ধলা মিঞা বলে। এখনো ছমির, নসির, সাত্তারদের যেমন নাম ধরে ডাকে তেমন নাম ধরে ডাকে না আসফাককে।

সেই সময়ে বড়বিবির সঙ্গে অনেক কথা হত। একদিন বড়বিবি বলেছিল, তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখো, তা সবই কোনো না কোনো জাফরের। এই যে বন দেখো, তাও একজনের।

আসফাক বলেছিল, এই এত বড় বন। যে বনের মালিক সে কি এতবড় বনকে আগাগোড়া চোখেই দেখেছে, যে তার হবে?

বড়বিবি ফুরসিতে ঠোঁট লাগিয়ে বলেছিল, এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখো সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও, বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে, সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে করো, তাও সেই মালিকের।

বড়বিবির গল্প শুনতে শুনতে ঘুম পেয়ে যায়।

কোথায় যাবে আসফাক জাফরুল্লার এক্তিয়ার ছাড়িয়ে?

.

দুপুরটা গড়িয়ে গেল। ছমির, সাত্তার, নসির, চাউটিয়া খামারবাড়ির এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করছে। ওদের সকলেরই স্নানখাওয়া হয়ে গিয়েছে। ছমির একবার তার বিশহাতের মধ্যে দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বাড়ির দিকে গেল। কিছু পরে সে পিরহান গায়ে ফিরেও এল। আসফাক বুঝতে পারল ছমির হাটে যাচ্ছে। সপ্তাহের হাট। এই সময়ে আসফাক ক্ষুধা অনুভব করল। চব্বিশঘণ্টা সে খায়নি। তা, এই খামারে আসার পরে চব্বিশঘণ্টা না খেয়ে থাকা তার এই প্রথম।

এখন সে কী করবে? দ্বারিঘরের বারান্দার পাশে উঁচু বাঁশের আড়াটায় পাট আছে। কাছেই লাটাইও থাকবে। সে বলদগুলোকে আর একটু সরিয়ে সরিয়ে বেঁধে দিয়ে দ্বারিঘরের দিকে চলল।

আবার ছমিরের সঙ্গে দেখা হল। ছমির তা হলে হাটে যায়নি। টাকাপয়সা ধামা আনতে অন্দরে গিয়েছিল। এখন হাটে যাবে।

মুখোমুখি দেখা হতে আসফাক বলল, হাটৎ যাইস একা।

রাখাও যাইবে।

ও আচ্ছা, বলে আসফাক পা বাড়াল।

ছমির বলল, এক কথা। আইজ তো তোরা আছে। তা আমি ঘরৎ যাই। কী কও।

আর কাঁয় থাকে খামারৎ?

কাঁয়ও না।

কেনে, ব্যাপারি?

আজি না আইসে।

ছমির চাকর বটে কিন্তু এ গ্রামেই তার বাড়ি। কাল রাত্রিতে সে বাড়ি যায়নি। জাফরুল্লার বাড়িতে পাহারা দিয়েছে। আসফাককে পাহারার ভার দিয়ে বাড়ি যেতে চায়।

আচ্ছা, যাও, বলে আসফাক হাঁটতে শুরু করল।

খানিকটা দূরে গিয়ে সে ভাবল : ছমির আজ থাকবে না। তা হলে সেই যে একবার আসফাক জাফরুল্লার ঘরবাড়ি তিনমাস ধরে পাহারা দিয়েছিল, আজও তেমন হল।

কিন্তু তফাত দেখো। কী যে ঘটে গেল! ঘাড় কাত করে থুথু ফেলল আসফাক।

দ্বারিঘর পার হয়ে সে বরং অন্দরের ঘরগুলোর দিকে তাকাল। ঘরগুলোর পিছন দিকে বাঁপাশে একটা ছোট বনের আভাস দিয়ে কতগুলো গাছের মাথা। সবুজ মেঘের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। মেঘ নয় তা বোঝা যায় এজন্য যে, গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে নীল মেঘের ঢেউ। ওটাও অবশ্য মেঘ নয়। পাহাড়। যেন পাহারাদার হিসাবে অন্দরটা এখনই একবার দেখে নেয়া দরকার। যদিও এখন দুপুর সবে মাত্র গড়িয়েছে। যত দেরিই হয়ে থাক, ওষুধ আর ফেরত টাকাপয়সাও তো বিবিদের কাছে দিতে হবে। তার সেই বলদঘরের মাচা থেকে ওষুধ নিল সে।

অন্দরে ঢুকে আসফাক দেখতে পেলে বড়বিবিকে তার ঘরের বারান্দায়। যথারীতি সে নীচু একটা মোড়ায় বসে তার ফুরসিতে তামাক টানছে। তার সামনে গিয়ে ওষুধের শিশি আর পয়সা নামিয়ে দিল আসফাক।

অন্দরের তিনদিকে ঘর। বড়বিবি আর কমরুনবিবি দক্ষিণদুয়ারি ভিটায় পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকে। মেজবিবির ঘর উত্তরদুয়ারি, ছোটবিবির ঘর তার লাগোয়া কিন্তু পুবদুয়ারি। মাঝখানে উঠান। তা বৃষ্টিবাদলের দিন ছাড়া ভিটা উঠান নুরীর কল্যাণে নিকানো ঝকঝকে তকতকে। এই নুরী ঝি পারে বটে। সকালে একপেট পান্তা খেয়ে সে তার গোবর-কাদার চাড়ি আর পাটের

নুড়ি নিয়ে নিকোতে শুরু করে। এঘর ওঘর করে সব ঘরের ভিটা, মেঝে, বারান্দা, তারপরে উঠোন। পাঁচ-ছ ঘণ্টা একটানা কাজ করে। গোবর-কাদার চাড়িটাই তো আধমণি হবে ওজনে। অবলীলায় সেটাকে সরিয়ে সরিয়ে সে উবু হয়ে বসে লেপে যায়। তার নিজের ওজনও মণবুয়েক হবে। দরকার হলে খড়িও ফাড়তে পারে, যদিও নাকছাবি, কপালের চুল আর থলথলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুক দেখে বুঝতে পারা যায় সে মেয়েমানুষ। চাকরদের মহলে ঠাট্টা, সে এক মাদিমোষ, যে মানুষের মতো কাজ করতে শিখেছে।

কে? আসফাক! বলল বড়বিবি।

জে।

বড়বিবি হাসল। নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তার মুখের পেশীগুলোর মধ্যে তার চোখদুটো ডুবে গেল হাসির দমকে।

হাসি থামলে বড়বিবি বলল, কেন, পথ হারাইছিলা?

জে।

আবার ফুরসিতে মন দিল বড়বিবি। আর আসফাক সেই নীচু করে রাখা মুখের দিকে তাকাল। এবার সে বড়বিবির উপরের ঠোঁটের উপর সরু সাদা গোঁফের রেখাটাকে দেখতে পেল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ তুলল বড়বিবি আর তখন তার মুখখানা হালকা গোঁফের রেখা সত্ত্বেও, বোধহয় তার সাদা চুলের কুণ্ডলীগুলোর জন্য, স্নিগ্ধ দেখাল।

সে বলল, জ্বর হইছে আসফাক? চোখু দুখান লাল দেখং।

আসফাক উত্তর দিতে পারল না।

বড়বিবি বলল, তা হয়। ভুলুয়া ধরলে কালে জ্বর হয়।

ভুলুয়া একটা অপদেবতা যা মারাত্মক চেহারা নিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কোনো মানুষ যদি সে অপদেবতাকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারে তা হলে সে কৌতূহলের বিষয় হয়, আর রাতের অন্ধকারে পরিচিত পথ চিনতে না পেরে গোলকধাঁধায় ঘোরার সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কৌতুকেরও হয়। খেতে এসে ছমির, সাত্তার, নসির আসফাকের ভুলুয়া ধরার গল্পটা নিশ্চয়ই করে থাকবে। বিবিদের সকলেরই কৌতূহল থাকার কথা। তাছাড়া এখন রান্না-খাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে।

প্রথমে এল মেজবিবি প্রায় ছুটতে ছুটতে। তা বছর চল্লিশ বয়স হবে তার। মোটাসোটা হাসিখুশি মানুষ। কিছু বলার আগেই সে খিলখিল করে হাসল। হাসি থামলে বলল, ত্যা আসফাক, ভুলুয়ার শিং কেমন ছিল? তাক দেখছ?

হাসির শব্দে আর জোরে জোরে বলা কথার শব্দে পায়ের মলের শব্দ তুলে ছোটবিবি, আর তারপর বড়বিবির পাশের ঘর থেকে ধীরে সুস্থে কমরুনবিবিও বেরিয়ে এল।

ছোটবিবির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে, যদিও জাফরুল্লার বয়স তিনকুড়ির উপরে। ছোটবিবি সব সময়েই ফিটফাট থাকে। এখনো তার পরনে আসমানি নীল শাড়ি। আর চোখে সুর্মা। আর তার হাঁটা চলা দাঁড়ানোর কায়দায় তার রঙিন কামিজ চোখে পড়বেই অল্প অল্প। কমরুনবিবির বয়স বরং বেশি যদিও সে শেষ নিকা। ছোটবিবি যদি দশ-বারো বছর আগে এসে থাকে, কমরুনবিবির সবে সাত সাল চলছে। তা কমরুনবিবির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে, ভারভরন্ত শরীর।

ছোটবিবি বলল, তা দেখং, আসফাক, তোমার চোখুও লাল। ভুলুয়ার চোখু লাল থাকে, সাত্তার কইছে।

আসফাক কিছু না বলে তার উশকোখুশকো মাথাটা ঝকাল। এতক্ষণে সে অনুভব করল, তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে

ছোটবিবি শিউরে উঠে দুরে সরে গেল। তার সেই শিউরে ওঠা দেখে মেজবিবিও তাড়াতাড়ি দুপা পিছিয়ে গেল। সেখান থেকে বলল, বড়বিবি, উয়া তেল পানি খাওয়া লাগে?

বড়বিবি ভাবল। একটু পরে বলল, না বোধায়।

আসফাক ভাবল ওষুধ দেয়া হয়েছে, এখন ফিরে যাওয়া ভালো।

ছোটবিবির চোখদুটো উত্তেজনায় ঝকমক করছে। এ সময়ে তাকে যেমন সুন্দর তেমন ধারালো দেখায়।

গম্ভীর হয়ে বড়বিবি বলল, এলা পানি-পড়া খাওয়া লাগে। আর হাতৎ বান্ধা লাগে তাগা। তো মাইঝলা, তোর ঘরৎ কালা সুতা হইবে?

মেজবিবি মাথা ঝাঁকাল। ছোটবিবি বলল, রোস, মুই আনং। সে তার নিজের ঘরে গেল। আসফাক এবার অবাক হল, তার চেহারা কি ভূতেধরা মানুষের মতো দেখাচ্ছে। একটু ভয়ই পেল সে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চোরাচোখে দেখল।

কমরুন অবাক হয়ে দেখছিল আসফাককে। এতক্ষণে সে তার ভারি কিন্তু মৃদু স্বরে বলল, কেনে, আসফাক, কাল দুইপরৎ খাও নাই, আতৎ খাও নাই, আজ দুইপরৎ খাওয়া বাদ দিলু।

মেজবিবির হেঁসেল আজ। সে বলল, ঠিক-এ তো। খাবু এলা আসফাক? পান্তা করা আছে ভাত।

বড়বিবি তার কর্তৃত্ব ফলাল। না, মাইঝলা। মনৎ খায়, উয়ার জ্বর আসি গেইছে। তো জলপান খায় তো আনি দেও। উপাসপারা ভাল হইবে আজ।

ছোটবিবি পায়ের পাতার উপরে নাচতে নাচতে তার ঘর থেকে একটা কালো কাপড়ের পাড় এনে দিল। আর বড়বিবি সেটা হাতে করে মন্ত্র পড়তে নিজের ঘরের মধ্যে উঠে গেল। আসফাক ভাবল, এখনই তাগা এনে পরাবে বড়বিবি তার হাতে। আর তা কি তার পরা উচিত? সত্যি কি তাকে ভুলুয়া ধরেছিল?

কমরুন বোধহয় আসফাকের না খেয়ে থাকার কথা ভুলতে পারছিল না। সে বলল, তোমার গামছাটা কোটে, আসফাক? চুড়া গুড় দেং। খায়া, পানি খাও।

আসফাকের সঙ্গে গামছা নেই। তার মনে পড়ল এতক্ষণে। তাহলে সেটাও সে কাল বনেই হারিয়েছে পিরহানের সঙ্গে। সে ভাবল, সে কথা বলা কি ভালো হবে?

এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এখন কার কী করা দরকার বোঝা যাচ্ছে না। তা হলেও এ এক ভয়-ভয়, খেলা। যা খেলতে ভালো লাগে। আবার

ছোটবিবি বলল, রোস, মুই গামছা আনি দেং।

সে শুধু গামছা আনল না। গামছায় করে খানকয়েক বাতাসাও আনল। তার হাত থেকে গামছা নিয়ে কমরুন নিজের ঘরে গেল। দুপ্রান্তে গিট দিয়ে গামছাটাকে থলের মতো করে চিড়া গুড় নিয়ে এসে আসফাককে দিল আর সেই গামছা নিতে গিয়ে চোখ তুলেছিল আসফাক। তখন তার লাল টকটকে চোখের উপরে ঝাপসা ধোঁয়া ধোঁয়া কিছু দেখা গেল।

মন্ত্র-পড়া কাপড়ের পাড়টাকে (সেটাকে আরো সরু করে ছিঁড়ে পাকানো হয়েছে) নিয়ে বড়বিবি তার ঘর থেকে এল। আসফাককে এগিয়ে আসতে বলল। আর সে এগিয়ে এলে তার ডান কনুইয়ের কিছু উপরে বেঁধে দিল সেই তাগা। বলল, ভয় না খাও আসফাক। জ্বর জোর হইবে না, মনৎ খায়। পানি না ডুবান আজ।

মেজবিবি বলল, এলাও কি উয়ার পানিৎ ডর আছে?

ভুলুয়া যে অনেক সময়েই মানুষকে জলের ধারে কিংবা জলার পাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, এ তো জানা কথাই। ছোটবিবি আর একবার শিউরে উঠল।

অন্দরের থেকে বেরনোর সময়ে বাড়ির পিছন দিকের পথ ধরল আসফাক। খানিকটা দূরে গিয়েই একটা ঝোরা। জল এখন এত কম যে মার্বেলের গুলির মতো ছোট ছোট পাথরের সবটুকু ডোবে না। দহের কাছে গিয়ে, অবশ্যই, ক্রমশ গভীর। ঝোরার পাশ দিয়ে হেঁটে চলল আসফাক। জলপানের গামছাটার গিট দেয়া একপ্রান্ত তার হাতে, অন্য প্রান্ত কাঁধের উপরে। বেশ বড়, আর নতুন গামছাই। আর তা থেকে একটা সুগন্ধ উঠছে। আসফাক ভাবল, ও, এটা তা হলে ছোটবিবির নিজের ব্যবহার করা গামছা। সে জন্যই এই মিষ্টি গন্ধ। কবে যেন এরকম মিষ্টি গন্ধ সে পেয়েছিল!

দহের কাছে ঝোরার ধারে একজায়গায় দু-তিনটি পিঠুলিগাছ। আসফাকের মনে পড়ল-জাফর একদিন বলেছিল, বড় গাছটাকে খড়ির জন্য কাটলে হয়। আসফাক স্থির করল, এবারও যদি জাফরের দু-চারদিন ফিরতে দেরি হয়, গাছটাকে সে কেটে দেবে।

কিন্তু তফাত দেখো, সেবারে আর এবারে। আর এসব কিছুর জন্যেই দায়ী সেই হাকিম। হাকিম না এলে, আর সে সকলের সঙ্গে দরবার না করলে, এমন হত না।

পিঠুলিগাছটার নীচে একটা পুরনো গোবরের স্তূপ। অনেকটা উঁচু। উপরটা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। ঢিপিটার পাশে একটা বড় মোরগ চরছে। প্রকাণ্ড কালচে খয়েরি রঙের, মাথার ঝুঁটি টকটকে লাল। আধা-ওড়া আধা-ছোটার ভঙ্গিতে সেটা ঢিপিটার উপরে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর পাঁয়তারা

করার ভঙ্গিতে, একবার ডান একবার বাঁ পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটাকে সরাতে লাগল। আর তখন আসফাক তার পায়ের বড় বড় নখগুলোও দেখতে পেল। পুরনো সার সরে যাওয়ায় উপরের স্তরের চাইতে নরম গোবর বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ঠোঁট না নামিয়ে নিজের এই আবিষ্কারের গর্বে গলা ফুলিয়ে মোরগটা কক কক কক করে ডাকল। ঝপ করে একটা শব্দ হল। আসফাক দেখল, মোরগটার কাছে একটা মোটাসোটা, তার মতোই বড় সাদা মুরগি উড়ে এসে পড়ল। কিন্তু মোরগটা এক ধাক্কা দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল। সেটা ঢিপির নীচু দিকে পা দিয়ে গোবরের স্তরটাকে খাবলাতে লাগল। মোরগটা তার সেই আবিষ্কারের জায়গার চারপাশে তার বড় বড় নখওয়ালা পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটাকে ভাঙতে লাগল। ঝুপ করে আর একটা শব্দ হল। আর একটা মুরগি এসে পড়ল। আর তা দেখে মোরগটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন তার গগাবরশৃঙ্গ থেকে নেমে পড়ল। যেন তার পুরুষোচিত পরিশ্রমের পথে এরা বাধাস্বরূপ। কিন্তু তা নয়। গোবর আড়াল থেকে আর একটি মুরগি আসছিল, সেটিকেই পছন্দ হল তার। সেটার দিকে তেড়ে গেল। আর...

আসফাক ঢিপিটার পাশ দিয়ে গেল। মোরগটা তাকে গ্রাহ্যও করল না। এখানে বোরাটা খানিকটা গভীর। একহাত জল হবে। আর তা বহতা এবং পরিষ্কারও। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গা খুঁজে নিয়ে আসফাক বসে পড়ল তার জলপানের গামছা নিয়ে।

সে এবার খেতে শুরু করল। খানিকটা খেয়েই জলপিপাসা পেল তার। ঝোরার ধারে গিয়ে গোরুদের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে জলে মুখ নামিয়ে জল খেল সে। আবার খেতে বসল সে। গামছাটার সুগন্ধ আবার নাকে গেল তার। হাতে বাঁধা কালো সুতোর তাগাটাও চোখে পড়ল। জল খেয়ে মুখটা সরস হয়েছিল। জলপান মুখে সুস্বাদু বোধ হল এবার। ক্ষুধাবোধটা জেগে উঠেছে।

ক্ষুধার তৃপ্তিতে মন যখন ডুবে যাচ্ছে, তখন সে ভাবল : তা হলে বিবিসাহেবরা মেনে নিয়েছে যে তাকে ভুলুয়াই ধরেছিল। আর তা হলে তা সকলকেই মেনে নিতে হবে। জাফরও মানবে।

সে খুঁতখুঁত করে হাসল। তারপর কথাটা তার মনে তৈরি হল। শোধবোধ। তা, ব্যাপারি তোমরা থাপ্পড় মারছেন, মুইও দেরি করছং। তোমরা মরেন নাই। তামাম শুধ।

গামছাটার চিড়ার অধিকাংশ শেষ করে, বাকিটুকু জলের উপরে ঢেলে দিল সে। হালকা চিড়াগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে কিছুদূর, জলে ভারি হয়ে তলিয়ে যাওয়ার আগে। তা, এই সুগন্ধ চিড়াও সকলের জন্য নয়। কমরুনবিবির নিজের ঘরে ছিল। বিবিসাহেবানদের জন্য তৈরি হয়। খুব তৃপ্তি করে জল খেল আসফাক ঝোরার জলে ঠোঁট লাগিয়ে। তারপর সে জলে

পা নামাল। পা দুখানা ভালো করে ধুল। অনেক জায়গায় কাটা-ছড়ার দাগ। দু-এক জায়গায় বাদামি বাদামি কাদা সরে যাওয়াতে রক্তের চিহ্ন বেরিয়ে পড়ল। জল লেগে জ্বালা ধরল। এ সেই ঘাসবনে ছোটার চিহ্ন। ধক করে উঠল আসফাকের বুক। সত্যই সেটা ভুলুয়া না কি?

জলে হাতমুখ ধুয়ে নতুন পাওয়া গামছায় মুছে, সে এবার বেশ স্পষ্ট করেই বলল, মুই ওষুধ আনং নাই। তোমরাও মরেন নাই। তামাম শুধ। সে আপন মনে খুঁতখুঁত করে হাসল।

এখন বেশ ভালোই লাগছে। সেই আধভিজে ঠান্ডা ঠান্ডা সুগন্ধ গামছাটা গায়ে জড়িয়ে সে আবার অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে শুরু করল। সুগন্ধ গামছাটার স্পর্শ কেন যেন ছোটবিবির কথা মনে এনে দিল। সুগন্ধ ধারালো এক পরীর মতো ছোটবিবি। আর এ যেন তারই গায়ের গন্ধ।

চমকে উঠে গামছাটাকে গা থেকে খুলল আসফাক। না, না, এ গামছা তো ফেরত দিতে হবে।

কয়েক পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল আসফাক। বেলা ডুবে যাচ্ছে। রং বদলাচ্ছে চারিদিকে। বনের দিকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো কমে আসছে। এতক্ষণ যেন সে জ্বরের ঘোরে ছিল, এখন জ্বরটা ছাড়ছে–সেজন্য ক্লান্ত বোধ হচ্ছে এখন। না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরটা টানটান ছিল, এখন ভেঙে আসছে আর তাতেই যেন আরো খারাপ বোধ হল।

এখন সে কোথায় যাবে? দ্বারিঘরে গিয়ে বসবে, না বলদগুলোকে ঘরে তুলবে? এখন তো তার অনেক কাজ। দেখতে হবে চাউটিয়া এল কিনা, রাখালগুলো মোষ নিয়ে ফিরছে কিনা। সেসব কাজ দেখাশোনা শেষ হলে অন্দরে খোঁজখবর নিতে শুরু করবে। বাড়িতে আজ জাফর নেই। ছমিরও থাকবে না। একাই তাকে সবদিকে চোখ রেখে ঘুরতে হবে।

.

সেবার আর এবারে তফাত আছে। তার মনের উপরে যে শক্ত স্তরটা জমেছিল, হাকিম সেটাকে খাবলে ঘা করে দিয়েছে ওই মোরগটার মতো। নীচের নরম কিছু বেরিয়ে পড়েছে।

মুই অষুধ আনং নাই, তোমরা নাই মরেন। কিংবা এ ওষুধটা কি তেমন নয় যার অভাবে মানুষ মরে? ধক করে উঠল আসফাকের বুকের মধ্যে। এ ওষুধ। কি শুধু বিবিদের ঘরে যেতে লাগে? কিন্তুক মোর দেরিটা থাকি গেইল!

এখন সবই উদাস হয়ে মেনে নিতে হবে, যেন গাড়ি টেনে টেনে চলা।

.

অনেকদিন আগেকার কথা। তা, সাত সাল হবে। চালার নীচের লুকানো জায়গা থেকে নেমেই আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল। অবশেষে এমন

জায়গায় এসে পৌঁছেছিল, যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময়েই চোখে পড়ে। শালের জঙ্গল। তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি, জোতজমা। হলুদ ফসল। তারপর আবার সবুজ বন। এমন করে বন আর কৃষকের জমি পর পর। সাধারণত মানুষ দিনে হাঁটে, রাত্রিতে বিশ্রাম করে। আসফাক তখন উলটোটা করছিল। চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় ব্যাপারটা অন্য রকম হল। আগের সন্ধ্যায় পথের ধারের একটা জমি থেকে গোটা দুয়েক শশা চুরি করেছিল সে। কিন্তু আজ কী হবে, এই ভাবনা নিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোট শালবন তার সামনে, সেটাকে পার হতে হবে। যদি তার ওপারে কোনো খেতে শশা বা ফুটি থাকে। এদিকের খেতে সরষে। কোথাও এতটুকু ছোলা-মটরের চাষ নেই যে তা খেয়ে বাঁচা যাবে। থমকে দাঁড়াল সে। অদ্ভুত দৃশ্য তার সম্মুখে। জঙ্গলের মধ্যে নীল-নীল আলো। আরো দূরে দপদপ করে মেটে-মেটে আলো জ্বলছে। তার কাছাকাছি সাদা-সাদা কী যেন সব। ভয় আর কৌতূহলের টানে আরো দু-এক পা এগিয়ে গিয়েছিল আসফাক আর তখন সে আবিষ্কার করেছিল, বনের অন্ধকার হয়ে আসা গাছের ফাঁকগুলোতে আট-দশটা মোষ চরছে। কাছের আলোগুলো মোষের চোখ। আর সেগুলোর পিছনেই পাঁচ-সাতটা তাঁবু। হাত-তিনেক উঁচু একটা করে বাঁশের আড়ের উপর দিয়ে একটা করে কাপড় দুদিকে নামিয়ে এনে চারটে খোঁটায় কাপড়ের চারকোণ বাঁধা। সেই তাঁবুর মধ্যে পুরুষ-মেয়ে-শিশু। আগুন জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে কথা বলছে, যেন ঝগড়া লেগেছে। কিংবা ভয় পেয়েছে। তার একবার মনে হয়েছিল, ওখানে গেলে কি কিছু খেতে পাওয়া যায়? যেন দূর থেকেই খাবারের সুগন্ধ আসছে। হ্যাঁ, নিছক খাদ্যেরই একটা সুগন্ধ আছে, তা পোড়া-পোড়া ময়দার তাল হোক কিংবা আধফোঁটা আধপোড়া ভিজে চাল হোক। কিন্তু যারা নিজেরাই রেগে আছে কিংবা ভয় পেয়েছে, তারা উটকো অপরিচিত লোককে খেতে দেয় না। আর অত যেখানে উত্তেজনা, সেখানে যাওয়াও যায় না। তখন বর্ষা-বাদল ছিল না। বনের মধ্যে ঢুকে একটা গাছতলায় শুয়ে পড়েছিল আসফাক।

এই তাঁবুর বস্তির কাছেই কমরুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। আর ক্ষুধাই তাকে বস্তির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষা করে কিছু কি পাওয়া যাবে না?

ক্ষুধা সম্বন্ধে সে প্রায় সাত সাল ভুলে আছে, কিন্তু ক্ষুধা সম্বন্ধে জানতে তার বাকি নেই। খেতে যেসব ফসল থাকে, তার সব খাওয়া যায় না। ফলের খেত আর কয়টা? মানুষ শুধু ফল খেয়েও বাঁচে না। কঠিন অসুখ করে, আর তখন মনে হয় চুরি করে কাঁচা-কাঁচা শুটি আর ফল খাওয়ার পাপেই অসুখ। শহরে তৈরি করা খাবার পাওয়া যায়। কিন্তুক পাইসা লাগে। চেয়ে-চিন্তে খাওয়ার জায়গা সেটা নয়। তা হলে আর ই মাথায় উ মাথায় সড়কৎ

মানুষ পড়ি থাকে কেনে?আর তা ছাড়া শহরের পথই তখন সে চিনত না। অন্য কথায়, হয়তো, হয়তো, শহরের পথ খুঁজতেই সে এই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। বনে পাখপাখালি আছে, খরগোশ লাফারু থাকে। ঝোরায় মাছ থাকে। সে সব ধরতে পারলে খাওয়া যায়। কিন্তু আগুন লাগে, লোহা লাগে। লোহা ছাড়া পাখপাখালি ধরা যায় না। খাওয়ার উপযুক্ত করা যায় না। আগুন দিয়ে না ঝলসালে তা মুখেও তোলা যায় না। আর এখন তো সে জানে, সব খেত যেমন কারো না কারো, সব বনই তেমন কারো না কারো। ইচ্ছামতো তুমি বনের পাখপাখালিও ধরতে পারো না। লুকিয়ে চুরিয়ে মানুষের চোখ এড়িয়ে মাত্র তা করা যায়। আর তখন তার পিছন ফিরে আবার গ্রামের দিকে যাওয়ারও উপায় ছিল না। পথের ধারের অনেক খেত থেকেই সে ফুটি, শসা, ছোলা-মটরের শুটি চুরি করেছে। সে সব মাঠের ধারে তার পদচিহ্ন। এখন সে পদচিহ্নর রেখাকেই এড়িয়ে যেতে হবে।

সে সময়কার ক্ষুধার কথা ভাবলে শরীর আনচান করে। আর সেই মোরগের মতো টিপি খাবলানো হাকিমই এসব কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। সেবার যখন জাফর তিনমাস খামারে ছিল না, তখন কিন্তু বেশ একটা মোরগের মতোই ঝুঁটি ফুলিয়ে বেড়াত আসফাক।

ক্ষুধাই ফিরিয়ে এনেছিল তাকে সেই তাঁবুর বস্তির কাছে।

একটু চমকে উঠল আসফাক। আধরশি দূরে পথের ধারের ঝোপটার আড়াল থেকে প্রকাণ্ড শিংওয়ালা একটা প্রকাণ্ড মাথা বেরোচ্ছে। না, ওটা আর কিছু নয়। মোষ ফিরছে বাথানের দিকে। তার হিসাব মতে, সকলের আগে চাউটিয়ার গল্পের সেই মর্দা মোষটাই। আসফাক অনুভব করল, এবার তার ওঠা দরকার। রাখালরা বাথানে ঠিকঠাক সব কটাকে ঢোকাল কিনা তা দেখা দরকার। বলদগুলো বাঁধা আছে, সেগুলোকে ঘরে আনা দরকার। সেবার এসব ব্যাপারে সে উৎসাহিত ছিল। এবার—

সেই মোরগটা-ওটা কিন্তু জাফরুল্লার মতোই বরং। নতুন মুরগি দেখা মাৎৰ-চার বিবি জাফরুল্লার। তিন বিবি তো ছিল, কিন্তু—

এসব ডিঙিয়ে তার মন আরো অনেক দূরে চলে গেল। যেন বনের মধ্যে যেখানে কালো আর লালচে আলো তার মধ্যেও তার চোখ আছে।

.

আসফাক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল, তাঁবু খুলে নিয়ে লোকগুলো কোথাও যাওয়ার যোগাড় করছে। একটা করে তাঁবু ওঠে আর মোষের পিঠে তাঁবু আর অন্যান্য সরঞ্জাম চাপিয়ে দুজন তিনজন প্রাণীর একটা করে দল রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তাঁবু উঠে গেল, সব পরিবারই রওনা হয়ে গেল। আর তখনই সে দেখতে পেল, খানিকটা দূরে একটা মোষ তখনো বাঁধা। অন্য সব মোষ যেমন করে বাঁধা ছিল, একটা পা লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর

একটা ঝোপের। আড়ালে অন্য তাঁবুগুলো যেখানে ছিল, তার থেকে কিছুদূরে একটা তাঁবু যেন, অন্য তাঁবুগুলোর মতোই পুরনো, খানিকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া। আশ্চর্য, ভুলে গেল নাকি এটাকে নিতে?

ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে তাঁবুটার কাছাকাছি গিয়ে আসফাক চমকে উঠল। সেই তাঁবু ছিল কমরুন আর তার স্বামীর। স্বামীর বসন্ত। কিছুক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়েছে। এসব আসফাক পরে জেনেছিল। সে তখন দেখল, তাঁবুর নীচে মাটিতে একটা চটের বিছানায় এক পুরুষের মৃতদেহ, সারা গায়ে ঘা আর ফোস্কা। সে সময়ের কথা সব মনে আসে না। যেমন আসফাক মনে করতে পারে না, কেন সে না পালিয়ে কমরুনের কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছু খেতে পাওয়ার আশা নিশ্চয়ই ছিল না। অনেকক্ষণ সে নিজের চিবুকে হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। কমরুন কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে নাক ঝেড়ে আর একবার কাঁদতে শুরু করার আগে আসফাককে দেখতে পেল।

তারপর কবর দেয়া হয়েছিল কমরুনের স্বামীকে। একটা সুবিধা জুটে, গিয়েছিল। কাছেই একটা ঝোরা। বর্ষার শেষে নাতিগভীর সেই ঝোরাটার কাকর-পাথর মেশানো মাটির পার ঘেঁষে মাছ ধরার জন্য কেউ গর্ত করে থাকবে। সেই গর্তে তার চটের বিছানা সমেত মৃতদেহটাকে রেখে চারিদিক থেকে পাথরকুচি মিশানো বালি-মাটি আঁজলা আঁজলা তুলে এনে গর্তটাকে বুজিয়ে দেয়া হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে আসফাক যখন সেই গর্তটার উপরে রাখছিল, তখন বালিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল আবার কমরুন। আসফাক কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সেই ঝোরার প্রায় শুকিয়ে আসা খাদে নেমে গিয়েছিল, কারণ গর্তটার সঙ্গে ঝোরার জলের সংযোগ আটকানো পাথরগুলোর একটাকে সরাতে গিয়ে সে যা দেখেছে, তা যদি সাপের মাথা না হয়ে থাকে তবে সেটা প্রকাণ্ড একটা চ্যাং মাছ। মাছের সন্ধানে প্রায় আধঘণ্টা কাটল আসফাকের। সেখানে তো ঝোরাটা একটা নদী হয়ে উঠেছে। নদীটার মাঝখানে জল। তাতে তেও আছে, কোথাও বড় বড় পাথরও, অন্য কোথাও পাথুরে মাটির চরা। সেই চরার কোনো কোনো জায়গা নীচু, সেখানে মাটি ভিজে ভিজে, জলও দু-এক আঙুল কোথাও। এইসব জায়গায় কুচকুচে কালো, সাপের মতো চেহারার কুচলা মাছ থাকে গর্ত করে। সারা গায়ে কাদা মেখে আধ-হাত পৌনে-একহাত কয়েকটা চ্যাং, গজার, একটা হাত-দেড়েক লম্বা কুচলা মাছ ধরে ঘণ্টাখানেক পরে আসফাক তাঁবুর দিকে ফিরল। তার একটা কথাই মনে ছিল, এখন আগুন দরকার। মাছগুলো রান্না করতে পারলে ভালো ছিল, আর তা না হলে অন্তত পোড়াতে তো হবে। আর আগুন এই মেয়েমানুষটার কাছে থাকতে পারে।

সে তাঁবুর অবস্থানে পৌঁছে দেখল কমরুন তাঁবু খুলছে। আসফাক এখন বুঝতে পারে, তখন কমরুনকে আগুনের কথা বলা, মাছপোড়ানোর কথা বলা খুব বোকামি হয়েছিল। কমরুন বলেছিল, মড়া ছোঁয়ার পর স্নান না করে কেউ খায় না। বিশেষ করে সেই বসন্তের মড়া। তারপর তাঁবুতে যা কিছু ছিল, বেত-বাঁশের দুটি চুপড়ি, সরু সরু বাঁশের কয়েকটা লাঠি, খানকয়েক শাড়ি, লুঙ্গি, এমনকী তাঁবুর কাপড়, তাঁবু খাটানোর বাঁশ সব না ধুয়ে বাউদিয়ারা খায় না। কমরুন খাবে না। তখনই আসফাক জেনেছিল, যাকে কবর দেয়া হল সে কমরুনের স্বামী। তার বসন্ত হয়েছিল। কমরুন গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল। কাল বিকেলে অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। সন্ধ্যায় জানাজানি হয়। তাদের দলের অন্য লোকেরা বলেছিল, কমরুন ইচ্ছা করলে তাঁবু আর মোষ নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে। এখানে থাকলে সকলে মরবে। তারপর আজ ভোর হতে না হতে সকলে চলে গিয়েছে। যে লোকটা মরছে তাকে ফেলে কমরুন কী করে যাবে? এখন সে দেখছে, তারা যাওয়ার সময়ে তার তাঁবুর মূল্যবান জিনিস কিছু কিছু নিয়ে গিয়েছে।

খাওয়াটা অত সহজ ব্যাপার নয়। সে মাছগুলো সেদিন খাওয়া হয়নি। কমরুন তার তাঁবুর সব কিছু নদীর জলের ধারে নিয়ে এক এক করে ধুতে শুরু করল। এককে আসফাককে বলল, তোমরাও গাও ধোয়া করেন।

আসফাকের মনে ততক্ষণে এই অজানা রোগের আতঙ্ক এসেছিল। সে ঝোরায় স্নান করতে নেমেছিল।

খাওয়ার ব্যাপারটা সোজা নয়। কমরুনই বরং কতগুলো সরু সরু বাঁশের টুকরো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার আগে। আসফাককে দূরে থাকতে বলে সে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গিয়েছিল। বক সাবধানী শিকারি কিন্তু বকের চাইতেও সাবধানী কমরুন, একটা বাঁশের টুকরোয় আর একটাকে লাগিয়ে সরু লম্বা একটা নল তৈরি করে তাই দিয়ে গাছের উপর বসা একটা বককে ঠুকে দিয়েছিল। সেই বকটাকে পুড়িয়ে খেয়েছিল কমরুন, আর আসফাককেও দিয়েছিল খেতে।

কমরুন বলেছিল, সে রাতটা নাকি খুব ভয়ের। তবু দেয়া হলেও তাঁবুতে থাকা যাবে না। কমরুন বনে কোথাও গিয়ে ঘুমাবে। আসফাকের অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে বাধা কোথায়?

মৃত সম্বন্ধে একটা ভয় মানুষ মাত্রেরই আছে। আসফাক বনে ঢুকে দেখেছিল, মোষটা সারা দিন ধারেকাছের সব ঘাস খেয়ে ফেলেছে। সে সেটার দড়ি খুলে নিয়ে একটা ঝোপের পাশে বেঁধে দিল। সে জানত, এই ঝোপের পাতা খেতে মোষরা ভালোবাসে। সে মোষের কাছাকাছি শুয়ে পড়েছিল। বনে পোষা মোষ মস্ত সহায়। জন্তু-জানোয়ারের আসা-যাওয়া বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে পারে। সে ঘুমানোর আগে একবার ভেবেছিল

কমরুনের কথা। মোটা কমরুনের। সে রাত কাটাতে কোথায় বা আশ্রয় পেল!

কমরুনের স্বামীকে কবর দেয়ার পরের দিন যা ঘটেছিল, তার মতো আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছু নেই।

প্রথম ঘুমের পর আসফাক একবার উঠেছিল। অন্যদিন যেরকম হয় না, তেমন একটা ভয় ভয় করছিল। শালগাছের ফাঁক দিয়ে আবছা এক রকমের আলো। তাতে গাছপালার আকার বোঝা যায়, চেনা যায় না। সে দেখেছিল, মোষটা একটা ঝাকড়া গাছের তলায় কয়েক হাত দুরে শুয়ে আছে। সে উঠে গিয়ে মোষটার কাছাকাছি তার পিঠ ঘেঁষে শুয়েছিল। ভোর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে সে চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ থেকেই তার ঘুমটা হালকা হয়ে এসেছিল। এতক্ষণ সে অনুভব করছিল, মোষের গা-ই তার গায়ে লাগছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে চমকে উঠে বসল। কারণ তার হাতে যা লেগেছে, তা হয় মানুষের। মাথা কিংবা অন্য কোনো জন্তুর পশম-ঢাকা শরীর। সে ভোর ভোর আলোতে দেখতে পেয়েছিল, তার আর মোষটার পিঠের মধ্যে যে হাতখানেক ফাঁক সেখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছে কমরুন। তা, সেদিন কমরুনের ঘুম তখন খুবই গভীর ছিল বলতে হবে। আসফাকের চমকানি, ওঠাবসা, নড়াচড়া কিছু টের পেল না। শোক-তাপ, হয়তো কয়েকদিনের না-ঘুমানো, উদ্বেগের শান্তি, এসবই তাকে সেদিন নেশার মতো বিবশ করেছিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ভোরে উঠে দেখল আসফাক, কোথায় বাইদানি, কোথায় তার মোষ! যে জায়গায় ভিজে তাঁবুটা বাঁশের আড়ে টাঙিয়ে দিয়েছিল শুকাতে, যে জায়গায় বকটাকে পুড়িয়েছিল, নদীর ধারের সেই উঁচু পারটায় দুই হাঁটুর উপরে হাত দিয়ে ঘের তৈরি করে তার মধ্যে আসফাকের মাথা গুঁজে বসে থাকাও তার তুলনায় কিছু আশ্চর্য নয়। খুব ভোর থাকতে উঠেই তা হলে কমরুন রওনা হয়ে গিয়েছে।

কী ভেবে আসফাক ঝোরার পার দিয়ে হেঁটে চলল। তাকে কি কমরুনকে খুঁজতে যাওয়া বলা চলে?

নদীর ধারে ধারে এক প্রহর চলে কমরুনের বাঁশের টুকরোটিকে দেখতে পেল আসফাক। তার পাশে দুটো ডাহুক দড়িতে বাঁধা। একটা তখনো নড়ছে। কিছু দূরে বনের ধারে পিঠের দুপাশে বোঝা-ঝোলানো মোষটাকেও দেখা গেল। সেটা গলা বাড়িয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। কিন্তু কমরুন কোথায়?

অবশেষে তাকে দেখা গেল। একটা বড় পাথরের আড়ালে শাড়ি পাথরে রেখে সে স্নান করছে। পাহাড়ি নদী, ঝোরা বলা চলে না আর। স্বচ্ছ জল, স্নানের উপযুক্তই বটে, নদীর আসল স্রোত নয়, বরং তিরতির করে স্রোত চলছে এমন একটা বাঁক, কিন্তু গভীরতা একহাঁটুর বেশি নয়। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখবে কমরুন তার উপায় নেই।

কমরুন স্নান করে উঠে এসে আসফাককে দেখে হেসে ফেলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাহুকদুটোকে পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছিল। কমরুন এতক্ষণ কী সেলাই করছিল। এখন শুয়ে পড়েছে তাঁবুর ছায়ায়। দুপুরে এখন আর কী কাজ?

বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্মদরিদ্র আসফাক সেই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনি রঙের মতো মেঘ-মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ-মেঘ বনের মাথা। বাদামি রঙের সমান্তরাল সরলরেখার মতো গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হালকা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজে-নীলে মিশানো, কখনো বা মোষ-রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়েমানুষের শরীর। তা এখন শাড়িতে ঢাকা আছে বটে। কিন্তু কী এক সর্বগ্রাসী মাধুর্য কমরুনের মুখে, তার কপালে, একটু খোলা ঠোঁটদুটিতে, নীল মীনা-করা পিতলের নাকফুলে, আধবোজা চোখদুটিতে, যার কোণে হাসি জড়ানো মনে হয়। কেমন যেন অদ্ভুত শক্তিশালী টানে টানতে থাকে মানুষকে! আসফাক এখনো ভেবে পায় না কী করে তেমন সাহস হয়েছিল তার সেই দুপুরে!

কমরুন তাকে চড়-থাপ্পড় কিছু মেরে থাকবে। কিন্তু সেই প্রথম আসফাক, তার সেই রোগা রোগা আঠারো-উনিশ বছরের বুকে, দারুণ সাহস আর শক্তি পেয়েছিল। তাঁবুর দরজার কাছে বসে, তার একটা চোখে তখন সে কম দেখছে, নাক দিয়ে কিছু গড়াচ্ছে ভেবে হাত দিয়ে দেখেছিল রক্ত। কিন্তু তখন তার যে ভয় হয়েছিল তা এই যে-সে কমরুনকে মেরে ফেলেনি তো?

কিছু পরে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে শুনে, সে অবাক হয়েছিল। কমরুন বলেছিল, পানি ধরো, মুখ ধও, নাকৎ অক্ত দেখং। তখন আসফাকের মনে হয়েছিল, কমরুন মিটমিট করে হাসছে। না ঠোঁটে নয়, চোখের মধ্যে হাসি।

এরপর মোষের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে কমরুন একদিন হাঁটতে শুরু করেছিল। পিছন পিছন আসফাক। দু-তিন দিনে দলটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। কমরুন জানত, সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবে দলটা।

দলকে পাওয়া সহজ নয়। সেই গহন বনের মধ্যে তারা কোথায় গিয়েছে মোষগুলো তাড়াতে তাড়াতে, কে বলে দিতে পারে? বিশেষ করে যে দলের কোনো গন্তব্যস্থল নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু যারা কেবল চলেই বেড়ায়। আসাম বলে নাকি এক দেশ আছে। তার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে বছরখানেক আগে রওনা হয়েছে। পাহাড় আর তার কোলঘেঁষা বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হয়তো চেনা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এরা চলে যাবে। বন থাকলেই হল। সন্ধ্যায় যেখানে মানুষের চোখে পড়ে না, এমন জায়গায় তাঁবু ফেলে সারাদিনের সংগ্রহ আগুনে ঝলসে খেয়ে রাত কাটত আসফাক আর কমরুনের। সকালে তাঁবু গুটিয়ে মোষের পিঠে তুলে দিয়ে হাঁটা, আর হাঁটতে

হাঁটতে চারিদিকে চোখ রাখা, বনমোরগ, তিতির, ডাহুক, বক, মেটে আলু, চই, চ্যাং, শাটি, কুচলা, গজার সংগ্রহ করার দিকে। মেটেআলুর লতা দেখে আসফাক একবার প্রায় দশসের আলু সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ঝালের জন্য চই খুঁজে বার করতে কমরুনই পেরেছিল। কমরুন শুধু বয়সে বড় নয় (কমরুনের তখন এককুড়ি পাঁচ-ছয়, আর আসফাকের এককুড়ি হয়নি), অনেক বিষয়েই আসফাকের তুলনায় অভিজ্ঞ। পাখি শিকার, সেই মাংসকে খাদ্যে পরিণত করা, এমনকী লোহা আর পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো, মাছমাংস না পুড়িয়ে তাকে সুস্বাদু করা সেই আগুনে, কলাগাছের ডোঙা পুড়িয়ে ছাই তৈরি করে নুনের অভাব, আর চই দিয়ে ঝালের অভাব পূরণ–সব বুদ্ধিই কমরুনের।

একদিন আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল, বনে তারা ভাত, রুটি এসব খায় কিনা, খেলে কোথায় পায়। তা থেকে সে এই দলটার জীবনযাত্রার পদ্ধতি আরো খানিকটা জানতে পেরেছিল। এরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে, বছরে কোনো কোনো সময়ে এদের মোষ এত দুধ দেয় যে তখন তা থেকে মাখন তৈরি করে, ধনেশ পাখি পেলে তার চর্বি সংগ্রহ করে রাখে, বনে অনেক সময় হরিতকি, বহেড়া ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করে, প্রতি বছরই কয়েকটা করে মোষের। বাচ্চা বিক্রি করে–এসবে টাকা হয়, সেই টাকা থেকে চাল, আটা, কাপড় কেনা হয়। এসব ব্যাপারে দলের যে কর্তা সেই সর্বেসর্বা। তার কথা সকলকেই মেনে চলতে হয়। কারণ সে দলের ইতিহাস জানে, পশ্চিমাভাষায় কথা বলতে পারে, অসম্ভব সাহস তার, সে কখনো ঠকে না, বরং বনের কোলঘেঁষা কোন গ্রামের হাটে কী বিক্রি করা যাবে, কী কেনা যাবে তা যেমন জানে, তেমন জানে কোন অসুখে কোন লতা-পাতা লাগে। সে শুধু বসন্তের ওষুধ জানে না। হ্যাঁ, তাকে দলের স্বার্থে নির্দয় হতে হয়। যাকে বসন্ত ধরে ফেলেছে, তাকে তার মুখেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ তো বাঘ নয় যে মোষ সাজিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে, হাঁড়ি-হাঁড়া পিটিয়ে চিৎকার করে মোষের বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে।

তখন বনের পথে চলা মাসদুয়েক হয়ে গিয়েছে। শীতটা পড়ে যেতে শুরু করেছে। বনে ঘাসের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কোনো কোনো গাছে নতুন পাতা, কোনো কোনো গাছে ফুলের কুঁড়ি। বনে পাখির সাড়া বেশি পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় শুকিয়ে ওঠা এক ছোট ঝোরার কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় তাঁবু খাঁটিয়েছে কমরুন। এখন এ কাজে আসফাক তাকে সাহায্য করতে শিখেছে। সেদিন মোষটাকে তাঁবুর কাছাকাছি বেঁধে রেখে মাছের খোঁজে বেরিয়েছিল দুজনে। মাছ পাওয়ার আগে একটা মোটাসোটা তিতির পড়েছিল কমরুনের কাঠিতে। পরে ঝোরার কাদা খুঁচিয়ে দু-দুটো কুচলা মাছ। এত বড়, ধরার পরেও এমন কিলবিল করছিল তারা, যে মনে হবে ছোবল কাটতে পারে। তিতির রাতের জন্য থাকবে ঠিক করে, মাছদুটোকে পাকাতে বসেছিল কমরুন। ছুরির লম্বা

টানে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চিরে, ভিতরের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে ঝোরার দিকে গেল কমরুন। জল দিয়ে না ধুয়ে বরং শুকনো শুকনো এঁটেল কাদা দিয়ে মাছদুটোকে এমন করে লেপে দিল, সে দুটো যেন মাটির তৈরি লতা। তারপর পাথরে লোহা ঠুকে শুকনো ঘাসে আগুন জ্বেলে সে দুটোকে আগুনে ফেলে দিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে আগুন নিবে গেলে, সে দুটোকে বার করে টোকা দিয়ে দিয়ে পোড়ামাটি ভেঙে ধোঁয়া-ওঠা গরম গোলাপি মাংস নতুন শালপাতায় রেখে কমরুন আসফাককে খেতে দিয়েছিল। সুস্বাদু সেই মাছ খাওয়া হলে তারা ঝোরায় গিয়েছিল জল খেতে। ঝোরায় না নেমে জলের উপরে ফুঁ দিয়ে ভেসে আসা পাতাটাতা সরিয়ে পশুর কায়দায় জল খেয়েছিল!

তারপর বিশ্রামের সময়।

তখন আসফাক বোকার মতো বলেছিল, এখানে চিরজীবন থাকলে চলে কিনা। কমরুন মাথা কঁকিয়ে বলেছিল, দুজনে দল হয় না, আসফাক। আসফাক, তার পক্ষে যতদূর তা সম্ভব, তেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিল, কমরুনের অনেক বাচ্চা হলে দলটা ক্রমশ বাড়বে। তখন কমরুন বলেছিল, তা হলেও মোষ কোথায়? এই বুড়ি মোষের আর বাচ্চা হবে না। কী বিক্রী করবে যে কাপড় শাড়ি কিনবে, চাল, নুন, আটা কিনবে? তুমি কি বনের মোষ ধরতে জানো? তাদের দলের কর্তা যেমন মোষের ডাক ডেকে বনে-চরা অন্যের বাথানের মোষকে বিপথে টেনে নিয়ে ধরে ফেলে, তাই কি আসফাক পারে? না, এসব কিছুই সম্ভব নয়। আসফাক কি দু-তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে যে, দলকে শোনপুরের মেলায় নিয়ে যাবে, আসফাক কি পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে দল নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভাগতে পারে? আসফাক সেসবের পক্ষে একেবারেই বাচ্চা, কমরুনের চাইতেও ছ-সাত সালের ছোট। আসফাক নিজের অযোগ্যতার এই তালিকা শুনে মলিনমুখে বনের দিকে চেয়ে বসেছিল। কমরুন শুকনো নরম সবুজ ঘাসে শুয়ে একটু হেসে আসফাককে নিজের স্তনে টেনে নিয়েছিল।

কমরুনই বা কী করবে? দলের সন্ধান পাওয়া গেলে আসফাক তার সঙ্গে থাকত কিনা ভেবে লাভ নেই। হয়তো থাকত।

এদিকে বনের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত শেষ হয়ে প্রবল বর্ষা নেমে গেল। ঐ বর্ষা বাউদিয়ার কাছে ভয়ের ব্যাপার। তাঁবু খাটানোর মতো শুকনো মাটি পাওয়া যায় না। খাটালেও তাঁবুতে জল মানে না। পাখিরা পালায়। তিন-চারদিন চলে যায় একটা শিকার ধরতে। নদী ঝোরা ফেঁপে ফুলে প্রতি পদে পথ আটকায়। সে জলে মাছ ধরাও যায় না। বরং সে জল পেটে গেলে সেই ভয়ঙ্কর আমাশা ধরে যার ওষুধই হয় না। এই বন থেকে এখন উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হবে। গতবারের বর্ষার সময় বনের বাইরে এক রেল ইস্টিশনের পাশে বটতলায় তাঁবু ফেলে থেকেছিল বাউদিয়ারা। চারটে মোষ বিক্রি করে দলের খাওয়া-পরা চালিয়েছিল দলের কর্তা কান্টু বর্মন। ভাগ্যও কাজ

করে। ভাগ্য না হলে আসফাকই কি কমরুনের দেখা পেত? কমরুনের মতে যোগাযোগ অবিরত ঘটছে, তুমি সেটাকে কাজে লাগাবে কি না লাগাবে, সেটা তোমার বুদ্ধি।

মোষের নতুন গোবর দেখে এদিকে একদল মোষ গিয়েছে, এই আশা নিয়ে তারা যেদিকে রওয়ানা হয়েছিল, সেটা যে মহিষকুড়ার পথ তা তারা জানত না। মহিষকুড়া বলে যে একটা গ্রাম থাকতে পারে, তাই বা জানবে কী করে? অন্য একটা ব্যাপারও ঘটল। মোষটা যে বুড়ি তা কমরুনের কাছেই শুনেছিল আসফাক। তার চোখের একটা মণিও সাদা হয়ে গিয়েছিল বয়সের জন্য। ইদানীং সারা গায়ের হাড় চোখে পড়ত। বোধহয় সব দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ায় নরম ঘাস ছাড়া কিছু খেতে পারত না। কিন্তু সে যে এমন বার্ধক্য তা বোঝা যায়নি। একদিন সেটা কাদার মধ্যে বসে পড়ল। দেখো, মোষ বলে কথা, একহাঁটু কাদাতেই আটকে গেল। দুদিন ধরে মোষের তদবির চলল। গাছ-গাছড়ার দাওয়াই কমরুন যা জানত, সব প্রয়োগ করা হল। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে দেখা গেল শেয়াল খেতে আরম্ভ করেছে।

.

সেই কমরুন এখন জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তা বুদ্ধি আছে জাফরুল্লার। এখানে আসার মাসখানেক পর থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। যদিও আসফাক তখন তা ধরতে পারেনি। কবেই বা সে ঠিক সময়ে ধরতে পারে? তখন সে একবেলা খাওয়া আর দিন একটাকা কিংবা একসের চালের বদলে ঘাস নিড়াচ্ছে জাফরের জমিতে। কমরুনও কাজ করে জাফরুল্লার অন্দরে। দুবেলা নাকি পেটপুরে খায়। আর ইতিমধ্যে দুখানা আধা-পুরনো শাড়িও পেয়েছে। তা, ভাবল আসফাক, জাফরুল্লার হাসি নাকি কমরুনের দলের সেই কর্তা কান্টু বর্মনের মতো। তেমন করেই প্রায় কামিয়ে ফেলা হেঁড়ে মাথা। কমরুনই বলেছিল একদিন, মহিষকুড়ার বাইরে তখনো সে তাঁবুটাতে আসফাকের পাশে শুয়ে। হঠাৎ এক সন্ধ্যা থেকে কমরুন আর এল না। তারপর সেই দারুণ বর্ষায়, জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা।

কিন্তু, আসফাক নিজের অবস্থিতিটা বুঝবার জন্য এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু পিছন দিকে জাফরুল্লার বাড়ি চোখে পড়ল। এখান থেকে পশ্চিম দিকে সেই পিঠুলিগাছ, আর তার কিছু দূরে ঝোরা। সেখানে আকাশ এখন লাল হয়ে উঠছে। চোখ মিটমিট করল সে। যেন দেখতে চায় না। আসফাককে এখন কেউ দেখলে বলত, লোকটা হাঁপাচ্ছে। চোয়ালটা অবশ হয়ে গিয়েছে নাকি? মুখটা হাঁ করা। সেবার, সেই তিন মাস আগে, জাফরুল্লা যখন বাড়ি ছিল না কিন্তু তফাত আছে...সেই সেবার যখন জাফরুল্লাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

.

তখন একদিন বলদ আনতে গিয়েছিল আসফাক দহের ধারে। যখন সে বলদগুলোকে খোঁটা উপড়ে ছেড়ে দিয়েছে, কেউ যেন মৃদুস্বরে ডেকেছিল, আসফাক, ও আসফাক। বাতাসটায় জোর ছিল, শব্দটা ঠিক এল না। এরকম সময়েই, তখন বোধহয় দিন বড় ছিল। সেজন্য আলোটা একটু কম লাল। কিন্তু রোদ পড়ে গিয়েছিল। একবার সে মাথা তুলে শুনতে পেল, কে যেন কুই করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বাতাসটা আরো জোরে উঠে পড়েছিল। পথের পাশে বড় বড় ঘাস। সেগুলো বাতাসের তোড়ে ছপছপ করে গায়ে লাগছে। আসফাক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। পাক-খাওয়া এই ঝোড়ো বাতাস শেষ পর্যন্ত ঝড় হয়ে উঠবে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করল। এমন সময়ে বাতাসে ভেসে আসা কী একটা তার গায়ে পড়ল। সেটা গড়িয়ে পায়ের কাছে পড়লে আসফাক দেখল টোপাকুল। সে বিস্মিত হল। এদিকে টোপাকুলের গাছ কোথায়? দহের ওপারে একটা আছে বটে। ওপারের টোপাকুল এপারে এসে পড়বে এত জোর বাতাসে? কাজেই সে ওপারের দিকে তাকাল। আর তখন সে দেখতে পেল, দহের গলার কাছে যে সাঁকো তার উপরে সাঁকোটা অর্ধেক পার হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে কমরুন। বাতাসে তার চুল উড়ছে, মাথার কাপড় খসে গিয়েছে। পায়ের কাছে এলোমেলো কাপড়ের ঢেউ ওঠানামা করছে। আঁচলে টোপাকুল! আঁচল সামলে, শাড়ি সামলে সে আর এগোতে পারছে না। নীচের দহের জল আথাল-পাথাল।

ও আসফাক, আসফাক।

কী?

নামায়ে দাও?

কমরুন, জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি কমরুন।

তিন সাল আগে তখন আসফাকের বয়স এককুড়ি পার হয়েছে। কমরুনের এককুড়ি দশ হয়তো, তা হলেও কমরুনকে সে মাথায় ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আসফাক এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। আর তখন ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কোলে ওঠে, তেমন করে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে সেই টালমাটাল বাঁশের সাঁকো থেকে নামল কমরুন । কেমন যেন লজ্জা পেয়ে হাসল। সাঁকো থেকে নেমেছে তখন, পায়ে মাটি ছুঁলেও কিন্তু কমরুন দু-হাতে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। একবার সে মুখ তুলল, আসফাকের মুখটা দেখল, তার পরে আসফাকের কাঁধের উপরেই মুখ রাখল। যেন তখনো সাঁকোটা পার হচ্ছে।

তারপর মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল সে আসফাকের মুখোমুখি। বাতাস আর এক পাক খেলে গেল। খানিকটা ধুলো উড়িয়েও গেল। বাতাসের জন্যই যেন কমরুনের পদক্ষেপগুলো অসমান হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে পথের ধারে

বড় বড় ঘাসগুলো যেখানে বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে সেখানে কমরুন যেন হঠাৎ পড়ে গেল। বাতাস যেমন শব্দ করছে তেমন রিনরিন করে করে হাসল সে।

আসফাক বলল, পড়ি গেইছ?

কমরুন হাসল। তার চোখদুটো, যাতে সুর্মার টান ছিল, ঝিকমিক করল। মুখটা গাঢ় রঙের দেখাল। আসফাক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। আর তখন ধনুকের ছিলার মতো উঠে পড়ল কমরুন। হাসল। দৌড়ে পালাল। আসফাক তার গোড়ালির কাছে রুপোর বেঁকি মলের ঝলকানি দেখতে পেল। হয়, হয়, ঠিক-এ তো, তখন আসফাক এক সুগন্ধ পেয়েছিল, যে সুগন্ধ আজ ছোটবিবির গামছায়।

কমরুনের তেমন করা ভালো হয়নি। বিশেষ যখন জাফরুল্লা বিদেশে। তা ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। সেই বাতাসের মতোই আসফাকের রক্তে কী একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। তাতে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। তার চাপে কী হয়? সব নিষেধ সব বাধা ভেঙে মানুষকে একটা দিশেহারা শক্তিতে পরিণত করে। কিংবা কেউ যেন দারুণভাবে টানে, সেই টান আর বাধার টানে দম ফেটে যায়। চোখের সম্মুখে অন্ধকার হয়ে যায় আর সে অন্ধকার যেন রক্তের মধ্যে উথাল-পাথাল করে। হের জল যেমন লাফাচ্ছিল তখন।

একমুহূর্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল আসফাক। আশ্চর্য, এই সুগন্ধটা কিন্তু সেদিন ধরতে পারেনি আসফাক। হ্যাঁ, এরকম অবাক সে আগেও হয়েছে। তখনই কি বলেছিল কথাটা কমরুন, নাকি সেদিনই রাতে, আবার দেখা হলে? কমরুন বলেছিল : আ আসফাক, ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না পলান কেনে? এ তো বোঝাই যাচ্ছে, সেটা বর্তমানের অনুরোধ ছিল না। তারও চার বছর আগে আসফাক যা করতে পারেনি, সেজন্য অনুযোগ। কমরুন জাফরুল্লার বিবি হওয়ার আগে আসফাক খেত-নিড়ানো শেষ করার পর মোষ চরাত তখন। তখন যদি সে সেই সুযোগে একটা গাবতান ভৈষী নিয়ে পালাতে পারত, তাহলে হয়তো সে আর কমরুন হারানো দলটাকে খুঁজে বার করার জন্য আবার বনের পথে চলে যেতে পারত। নতুবা সেই গর্ভবতী ভৈষীর সাহায্যে নিজেরাই একটা দল তৈরি করে নিতে পারত।

.

ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। নিজের চিন্তায় সে এত দূরে চলে গিয়েছিল যে বাইরে মন দিতেই তার মনে হল, একটা কালো পাখি যেন তার মাথা ছুঁয়ে নেমে এল দুই ডানা নেড়ে। কমরুনের সেই বুড়ি মোষটার দিকে যেমন শকুন নেমেছিল।

সে চমকে উঠল। গা শিরশির করে উঠল। হাতের সেই তাগা চোখে পড়ল না। হাতড়িয়ে দেখল আছে কিনা। সে যেন অন্ধকারের মধ্যে হেসে উঠবে নিজের এই ভয় লক্ষ করে। কিন্তু হঠাৎ তার একটা সন্দেহ হল, ওরা কি সকলে ভুল বলছে? তেমন একটা ব্যাপার হয়নি সেই ঘাসবনে? তার কি মনে আছে, কেন তেমন হয়েছিল?

চাকররা সারাদিন কাজ করে, সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই তাদের খেতে দেয়ার নিয়ম। তারা খেয়ে যার যার বাড়িতে যাবে। আজও কিছুক্ষণের মধ্যে ছমির এসে খেতে ডাকল আসফাককে। কিন্তু সে নিজে এখানে খাবে না। খাবার নিয়ে বাড়ি যাবে। সে কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল।

ছোটবিবি এবেলাতে খাবার ঘরের মালিক। কথা সে ছমিরদের কারো সঙ্গেই বলে না। আসফাক আর তার মতো যারা, তারা বারান্দায় উঠে বসতেই নুরী এসে ভাত দিয়ে যেতে লাগল সানকি করে। তা চাকর-রাখাল ধরে সাত-আটজন হবে। ছোটবিবি কখনো সামনে আসে না এ সময়ে। নুরী তদবির করছে আজ।

খাওয়া যখন মাঝামাঝি হঠাৎ দমদম পা ফেলে রসুইঘরে এল মেজবিবি। তার পায়ের মল ঝমঝম করে বাজল। ভারি শরীর, ভারি পায়ের চাল। তা, আসফাকরা জানে দুকুড়ি বয়স হল তার। তার ভাব দেখেই বোঝা যায়, এবার কিছু হবে। চাকররাও এ-ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল! মাঝে মাঝে হয়! ঘরের মধ্যে কথাগুলো চাপা গলায় হচ্ছে, কিন্তু অন্যদিনের মতো বাইরে থেকেও কানে যাচ্ছে। ছোটবিবির দিকে মেজবিবি যদি তেমন করে ছুটে আসে, বুঝতে হবে ঝগড়া হবেই। এ ঝগড়ায় কেই বা দৃকপাত করে এখন? আসফাকের কিন্তু কানে গেল কথাগুলো। আর তখন তার অনুভব হল, সবই ঠিক আগের মতোই। মাঝখানে তার ওষুধ আনতে দেরি করে ফেলার ব্যাপারটা, আর তাও এর মধ্যে লোকে ভুলে যেতে শুরু করেছে। অন্তত এখন খেতে বসে সে বিষয়ে একটা কথাও কেউ বলছে না।

অন্ধকারে পা ছড়িয়ে বসল আসফাক। সব চাকরই বাড়ি চলে গিয়েছে। রাখাল-ছোকরা কজন আজ দ্বারিঘরের বারান্দায় ঘুমাবে। আসফাক আরাম করে বসে ছিলিম ধরাল আবার। সবই, ঠিক দেখো, আগেকার মতো। মাঝখানে হাকিম সাহেবের পাগলামি। কী? না, মানুষের দুঃখ দেখতে এসেছে। জমিজিরাত, হাজিরা নিয়ে কোনো অন্যায় নাকি থাকবে না। সব অন্যায়, সব অন্যায় নাকি দূর করবে!

যাক, এখন তো সব মিটে গেল। দুদিনের মাথায় পেটে ভাত পড়েছে। শরীর মনকে পরোয়া না করে স্নিগ্ধ হতে চাইছে, বাইরে স্নিগ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে মিলে যেতে চাইছে। ছিলিম ঢেলে সে উঠে দাঁড়াল। যেন রোজকার মতো এখন সে তার বলদের ঘরে শুতে যাবে। যেন সে কৌতুকবোধও করতে পারবে। বিবিদের ঝগড়ার কথা মনে হল। সে হাসল মিটমিট করে।

মেজবিবি বলল, নুরীক কনু পা দাবাবার।

এদিকেও আনাজ কোটা খায়।

মানষির তো ব্যথাবিষ হবার পায়।

বাব্বা। এক আইৎ ঘরৎ নাই তাও এত্ত গায়ে বিষ।

সে বিষ তোমার।

হয় তো হয়। নছিব করা লাগে।

অত্ত দেমাক না দেখাইস। নছিব! ত্যাও যদি খ্যামতা থাকি হয়!

খ্যামতা?

না তো কী? কমরুনক লাগে কেনে? মুই আর বড়বিবি নাই তো পতিত থাকলং। তুই পতিত কেনে, সোহাগি?

আসফাক ভাবল তা এটা এক মজাক দেখং। বলদের ঘরে এসে সে দাঁড়াল আগড়ের পাশে। আর একটু ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগলে হয়। সে ভাবল, এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, বড়বিবি, মেজবিবি, ছোটবিবি সবাই নিঃসন্তান। বড়বিবি এসেছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আর ছোটবিবিরও বছর দশেক হল আসা হয়েছে । এর মধ্যে তিনবিবির কারো সন্তান হয়নি। কমরুনবিবি নিকার আট-ন মাসের মধ্যে সন্তান দিয়েছে ব্যাপারিকে। বাড়ির গুণ বোধহয়-সাত সাল আগে মুন্নাফ, কিন্তু তারপরে কমরুনও দ্বিতীয় সন্তান দেয়নি ব্যাপারিকে!

এত বড় বাইরের চত্বরে এখন কিন্তু আর আলো নেই। দ্বারিঘর, মোষের বাথান, পোয়লের পুঁজ, গুদামের ঘর সব এক-একটা কালো কালো আকার মাত্র অন্ধকারে। একেবারে আলো নেই তা নয়। ধানমাড়াইয়ের নিকানো চত্বরে বসে তামাক খেয়ে সে ছিলিম ঢেলেছিল। বাতাসে সেই চত্বরের উপর দিয়ে সে আগুনের লাল লাল ছোট গুলি গড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। না, ওতে আগুন লাগে না। যেটা গড়াচ্ছে, একটু ফুলকি ছড়িয়েই নিবে যাচ্ছে।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলে আসফাক অন্ধকারকে বলল, তো, ব্যাপারি, তোমরা থাপ্পড় মারছেন, দশ বিঘা ভূঁই দিছেন, মুইও চাষ দেং নাই। মুই ওষুধ আনং নাই, তোমরাও না-মরেন। তামাম শুধ।

কিন্তু এখন কি তার শোয়া হবে? তার মনে পড়ল, কিছু কাজ তার বাকি আছে। জাফরুল্লা বলেছিল বটে, কয়েকদিনের মধ্যে তামাক বাঁধার চটি বাঁশ লাগবে। সোজা নয় প্রয়োজনটা। দু-তিনটে আস্ত বাঁশকে চটি করতে হবে। তাও আবার মাপমতো হওয়া চাই-লম্বায় পোন হাত, চওড়ায় দুই সুত, আর পাতলা কাগজের মতো। কাঁচা বাঁশ কেটে টুকরো করা আছে। এটা তারই

কাজ। গতবার যখন ব্যাপারি ছিল না তখন থেকেই সে এ কাজটা নিজে গুছিয়ে রাখে। এখনো দুঘণ্টা কাজ করা যায় অন্দর থেকে টেমি চেয়ে এনে।

আসফাক খুঁতখুঁত করে হাসল। অন্ধকারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আজ থাউক, কালি করা যাইবে। ইয়াকও তোমার শোধবোধের হিসাবৎ ধরি নেন, ব্যাপারি।

সে ভাবল, শোধবোধ যখন হলই তখন সেই হিসাব শেষ করার আগে এইসব ছোটখাট অবহেলা ও অমনোযোগও ধরে নিও। যেমন এই বাঁশের চটি না তোলা, যেমন গরু-মোষ ঠিকঠাক উঠল কিনা তা না দেখা, যেমন না ঘুমিয়ে সারারাত উঠে উঠে তোমার অলর পাহারা না দেয়া।

কোনো কোনো রাতে ঘুম সহজে হয় না। যেমন ধরো, অন্ধকারকে অন্ধকার মাত্র মনে না হয়ে অন্য কিছু মনে হতে থাকে। আসফাক স্থির করল, একটা কাজ তাকে করতেই হবে। গোটা দুয়েক মশাল তৈরি করে রাখা দরকার। যদি কোনো বিপদ হয় রাতে, আর যদি সে সাড়া দেয়ই তা হলে মশাল ছাড়া চলবে না। বাঁশের আগাল, কাটারি, পাট এই ঘরেই আছে। তেল আর দেশলাই যোগাড় করতে হবে।

একটা টেমি না হলে কি করা যাবে? উঠে দাঁড়িয়ে সে অলরের দিকে গেল। বড়বিবির ঘরেই থাকে তেল। কিন্তু ভেতর থেকে খুব মৃদু ফুরসির শব্দ পাওয়া গেলেও ঘরের দরজা বন্ধ। ওদিকের ঘরটায় আলোর ইশারা। মেজবিবির গলার সাড়া পাওয়া গেল।

কে? কাঁয়?

আসফাক।

কী চাও?

না। একটা টেমি।

ছোটবিবির দুয়ারৎ দেখ।

ছোটবিবির দুয়োরে টেমি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু লজ্জাও পেতে হল। মেজবিবির ঘরের জানালা খোলা ছিল। আর সেই খোলা জানালা দিয়ে সে মেজবিবির বিছানায় নুরী ঝিকেও দেখতে পেল। নুরী হয়ত মেয়েমানুষই, যদি তাকে এখন আরো বেশি মাদি মোষের মতো মনে হচ্ছে। মেজবিবির হয়তো সারা গায়ে বিষ, কিন্তু আবরু থাকা দরকার।

ছোটবিবির ঘরে আলোটা জোরদার ছিল।

কাঁয়?

আসফাক।

রইস।

ফিসফিস করে এই বলে ছোটবিবি উঠে এসে দরজা খুলল। আর চোখে ধাঁধা লাগল আসফাকের।

ছোটবিবি গলা নামিয়ে বলল, বইসেক। তোর গল্প শোনং।

জে?

ঠিক করি ক। পরী ধরছিল তো?

আসফাক লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল।

একেই তো পরী বলে বোধহয়। তা, পরীর মতোই দেখায় বটে ছোটবিবিকে, শালবাড়ির জঙ্গলে তাকে পরী নাই ধরে থাকে। ছোটবিবি রাতের ঘুমের জন্য তৈরি হয়েছিল। পরনে একটা পাতলা শাড়ি আলগা করে পরা। জলে ভিজলে যেমন হতে পারে, কোথাও কোথাও গায়ের রং আর বাঁক চোখে পড়ছে। চোখের কী জেল্লা! নাকফুল আর কানফুলের কাঁচগুলোর চাইতে সুর্মার টানের মধ্যে বসানো চোখের মণিদুটো বেশি ঝকঝকে।

এই সময়েই মেজবিবির জানলায় চোখ পড়েছিল আবার আসফাকের। আর তা লক্ষ করে ছোটবিবি অদ্ভুত এক স্বরে বলেছিল, উয়ার গাওৎ বিষ ধরে। উদিক না দেখিস।

তারপর সে আরো অদ্ভুতভাবে গলা নামিয়ে এনে বলল, আইসেক, খানেক গল্প করং।

আসফাকের মনে হল এরকম নামিয়ে আনা স্বর যেন কোথাও সে শুনেছে। সে বলল, তেল, টেমি আর শালাই লাগে।

ছোটবিবি কান পেতে শুনল। সে যেন আসফাকের এই অদ্ভুত প্রয়োজনের কথা শুনেই জোরে জোরে হাসল। আর সেই হাসিতে নিজেকে সামলে নিল।

সে গলা তুলে বলল : রইস, দেং।

তেল, টেমি, দেশলাই এনে দিল ছোটবিবি।

আসফাক নিজের ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে দেখল, ছোটবিবি দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবছে। গা শিরশির করে উঠল তার। বনের মধ্যে ভুলুয়া ধরলে এমন কাউকে দেখে নাকি কেউ কেউ! আর তখন তার দিকে না এগিয়ে উপায় থাকে না। সে পথই হোক, আর বিপথই হোক। কিন্তু রসুইঘরের ঝগড়াটাও মনে হল তার। দশ সাল হয় এই রূপসী ছোটবিবি জাফরুল্লার ঘরে। অথচ এই পঁচিশ-ছাব্বিশে এসেও সে এখনো পতিত। ছাওয়া-পোওয়া কিছু হয়নি। হয়তো সেই কষ্টে ঘুম হয় না।

নিজের ঘরে ফিরে আসফাক বাঁশের আগালে কেরোসিন তেল ভরে, তাতে। পাটের পলতে ডুবিয়ে দুটো মশাল তৈরি করে রাখল। আলো দেখলে খারাপ মানুষ, বনুয়া জানোয়ার কিছুটা ভয় পাবেই।

শেষ মশালটা তৈরি করতে করতে তার মনে হল, তিন বিবির খবর পেলাম, কমরুনকে দেখা গেল না। সে তো সত্যই ব্যাপারির সঙ্গে যায়নি।

.

টেমিটায় তেল নেই। মিটমিট করছে। রাত্রির অন্ধকারটাও গম্ভীর হয়ে আসছে। বাঁশের চটি তুলতে তুলতে অন্ধকারের দিকে চাইছিল আসফাক। চারিদিক সুমসাম হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বলদদের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে। আসছে, আর নিজের হাতের কাটারি বাঁশের উপরে যে মৃদু শব্দ করছে।

তখনো কিন্তু এমনই সুমসাম হয়ে যেত এই খামারবাড়ি। শুধু ব্যাপারি এবার তাকে দেখাশোনা করতে বলে যায়নি। তা হোক। কেমন একটা আলসেমি লাগছে। এবার সে শুতে যাবে। এই টুকরোটা শেষ হলেই হয়।

হঠাৎ সে থামল আর টেমির মিটমিটে আলোতে নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেল। দেখো কাণ্ড! সে না বলেছিল, এসব কাজ না করে কালকের জন্যে ফেলে রাখবে? বাঁশ আর কাটারি সরিয়ে রাখল সে। উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করল। চিবুকে হাত রাখল। কী যেন একটা মনে আসছে! ঠিক ধরতে পারছে না কী সেটা।

সেবারও অন্দরবাড়ি এমন সুমসাম হয়ে যেত, আর সারা রাতে প্রহরে প্রহরে উঠে সে অন্দরের বন্ধ দরজার সামনে সামনে ঘুরে তদ্বির তদারক করত।

এবারেও তা সে করেছে একবার। কিন্তু কমরুনবিবিকে আজ রাতে সে দেখেনি। খবর নেয়া দরকার। ওরা যেমন বেহিসাবি বিবিরা-দরজা-টরজা। ঠিকঠাক দিল কিনা তা দেখবার জন্য অন্দরের দিকে পা বাড়াল আসফাক। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ যেমন একটা আলসেমি লেগেছিল কাজ করতে করতে, তেমন কিছু অনুভব করল সে আবার। তারপর গা শিরশির করতে শুরু করল। গলার কাছে কী একটা দলার মতো ঠেলে উঠল। আবার তার মনে পড়ল, সেবারও এমন নিঃসঙ্গ ছিল ব্যাপারির বাড়ি। সে অন্দরের দিকে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সে অনুভব করল, দেখো, এ ব্যাপারটাও সে আগে বুঝতে পারেনি অন্য সব ব্যাপারের মতোই। ভাবো তো, কতদিন দেখা হয় না কমরুনের সঙ্গে! সেবারের সেই সাঁকোর কাছে কথা হওয়ার পর আর কথাও হয়নি। অন্য বিবিদের তদারক না করে সে সোজা কমরুনের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তার রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে গলায় ধাক্কা মারছে।

কমরুন, কমরুন, ঘুমাও? ওঠো। ফিসফিস করল আসফাক।

কমরুন তখনো ঘুমায়নি। ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বসে কী একটা সেলাই করছে।

ডাক শুনে কমরুন সেলাই নামাল হাত থেকে। উঠে এল জানালার কাছে।

কাঁয়? সব্বোনাশ! আসফাক? কমরুনের মুখ একেবারে রক্তহীন হয়ে গেল।

সে ফিসফিস করে বলল, ব্যাপারি ঘরৎ নাই।

জানং।

রাইত নিশুতি।

জানং।

তো? কমরুন যেন হাঁপাচ্ছে, আর তার দমকে তার মুখে একবার রক্ত আসছে, আবার সরে যাচ্ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো কমরুন দরজা খুলে দিল। তা করে সে কয়েক পা পিছিয়ে ভয় ভয় মুখে ঘরের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

আসফাক! কমরুন কী বলবে খুঁজে পেল না।

আসফাক বলল, কুমর, কী খুবসুরত তো দেখায়।

কমরুন বলল, রাগ খাইস না, আসফাক। মুই খানেক ভাবি নেং। তুই কেনে আসলু, আসফাক কেনে আসলু? তোক ঠিক-এ ভুলুয়া ধরছে।

কথাগুলো বলতে বলতে থরথর করে কেঁপে উঠল কমরুন।

আসফাক কমরুনের দিকে চেয়ে রইল। হলদে-সাদায় ডুরি একটা খাটো শাড়ি পরনে তার। গলায় একেবারে নতুন একটা রুপোর চিকহার কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঝকঝক করছে। কমরুন যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে তার সুদৃশ্য বিছানা। মশারিটা তোলা। সাদা ধবধবে বিছানায় দু-একটা মাত্র কোঁচকানো দাগ। আর কমরুনের এককুড়ির উপরে দশ পার হওয়া কিছু ভার মুখকে আলো করে নীল কাঁচের নাকফুল। ওটা সোনা না হয়ে যায় না।

কেন, কমরুন?

কী আসফাক?

আসফাক কথা খুঁজে পেল না।

কমরুন বলল, কেন আসলু আসফাক, এই রাইতৎ।

আসফাক হাসল। বলল, দেখেক কুমর, এলা মুই সিয়ানা হইছং। তোর মাথা ছাড়িয়া উঁচা।

জানং।

তো।

যেন তার দম আটকে আসছে এমন করে চাপা গলায় বলল কমরুন, আসছিস, আজ রাইৎ থাকি যা। কিন্তুক মোর গাও ছুঁয়্যা কথা কর, আর তুই আসবু না।

কমরুন কি কেঁদে ফেলবে-এমন ভয় হল আসফাকের। কী ওঠানামা করছে ওর সেই স্তনদুটি!

হঠাৎ আসফাক বলে বসল, ঠিক-এ তো। মুই যাং। তুই কেমন আছিস কুমর, তাই দেখির বাদে আসছং।

তুই রাগ না করিস, আসফাক, রাগ না খাইস।

না। রাগ কী!

দরজার কাছে ফিরে গেল আসফাক। কমরুন এগিয়ে এল দরজার কাছে। আসফাক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, দুয়ার দেও, কমরুনবিবি।

.

কমরুনের ঘরের ডোয়া ঘুরে বাইরে যাওয়ার পথ। সে পথে যেতে যেতে কমরুনের জানালা। চোখ তুলল আসফাক। সে দেখল, ইতিমধ্যে কমরুন জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে দেখল, কমরুনের গালে কী চকচক করছে, তাতে, চকচকে নাকফুলটা জল লেগে আরো চকচকে। তার মধ্যে হাসল করুন। অসম্ভব রকমের মিষ্টি সেই হাসি। আসফাক দাঁড়িয়ে পড়ল। কমরুন দুহাতে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল, এখন একটা হাত শিক গলিয়ে লম্বা করে দিয়ে আসফাকের মাথায় রাখল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলা যায় না। আসফাক সরে জানালার গোড়ায়, আর তার ফলে কমরুনের আঙুলগুলো আসফাকের চুলের মধ্যে খেলা করতে পারল। কমরুম এবার হাসল, সেই হাসির মধ্যে বলল, তোক ভুলুয়া ধরছে আসফাক। ঠিক-এ। তুই কেনে হাকিমক নালিশ জানালু ব্যাপারির বাদে?

তো?

আচ্ছা এলা যা।

আসফাক রওয়ানা হয়েছিল, কমরুন আবার ডাকল। একেবারে গলা নামিয়ে দারুণ গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, মুন্নাফ।

মুন্নাফ!

মুন্নাফ—

হ্যাঁ মুন্নাফ, তার পাছৎ কী?

শোনেক।

তারপর ফিসফিস করে কমরুন যা বলেছিল, তার অর্থ এই হয় যে সে মুন্নাফকে শিখিয়ে দিয়েছে, যতদিন কমরুন বাঁচবে সে আসফাককে মিঞাসাহেব বলে ডাকবে।

হ্যাঁ, তাই কয়। বলে আসফাক চলে এসেছিল।

নিজের শোবার মাচায় বসে তার যে অনুভূতি হল, তা কথায় দাঁড় করালে তার অর্থ হয়, এ কমরুন সে কমরুন নয়। দেখেছ তো, তার পোশাক, তার গহনা, তার সুস্বাস্থ্যে ডাগর হয়ে ওঠা শরীর, তার ঘর, তার বিছানা। তখন সেই তাঁবুর নীচে ছেঁড়া শাড়ি-পরা কমরুন, রোগা-রোগা পঁচিশ-ছাব্বিশের কমরুন এত সুন্দর ছিল না। না, না। সুন্দর ছিল বইকি। ছেঁড়া ময়লা কাপড় ফেলে রেখেছে, এমন সদ্যস্নাত দুইজনের অনাহার-কৃশ কিন্তু নীরোগ অবয়বে সৌন্দর্য নিশ্চয়ই থাকে। বনের গভীরে সেই তাঁবুর নীচে নতুন সংগ্রহ করা সেই ঘাসের উপরে নিশ্চয়ই তেমন সুন্দর ছিল কমরুনও।

কোনো কোনো কথা আছে উচ্চারণের সময়ে তার যতটা অর্থবোধ হয়, পরে সেটাকে গভীরতর মনে হতে থাকে। মিঞাসাহেবই বলে মুন্নাফ। কিন্তু আজ রাত্রিতে ঠিক ওভাবে বলল কেন কথাটা কমরুন! ওদিকে দেখো, এখন কমরুনের কথাবার্তা কেমন বিবিসাহেবাদের মতোই।

এই কথাটাই ভাবল আসফাক কিছুক্ষণ। বিবিসাহেবাদের মতো হয়ে গিয়েছে কমরুন। এও একরকমের সৌন্দর্য। কিন্তু বনে একদিন হরিণ-হরিণী দেখেছিল তারা। মসৃণ উজ্জ্বল রং আর কী হালকা সুঠাম চেহারা। কমরুনকে যেরকম দেখাত স্নান করে উঠলে সেই সব গাছের ছায়ায় ঢাকা অল্প আলোর ঝোরার ধারে—এখনো কি তেমন দেখায়?

তো, বিবিসাহেবা কমরুনও বলেছিল, তাকে ভুলুয়া ধরেছে। এখন কি সে সব ব্যাপারটা ভেবে দেখবে? হঠাৎ মনে হল ভুলুয়াই ঠিক! আর এই মনে হওয়ার ফলে তার হৃৎপিণ্ড গরম হল, ধকধক করতে লাগল। নতুবা কেন সে হঠাৎ মনে করেছিল, সে নিজেই একটা মর্দামোষ হয়ে গিয়েছে? মদামোষের মতো ডাক দিতে দিতে বনবাদাড় ভেঙে ছুটেছিল সে। ভুলুয়া না হলে কি তেমন হয়? তখন খুব ফুর্তি লাগছিল, রক্তের চাপে হাত-পায়ের শিরা ফেটে যাচ্ছিল যেন। মাচায় শুয়ে সে ভাবল-কমরুন বলেছিল, তাদের বাউদিয়াদলের কর্তা মোষের মতো ডাকতে পারত। আর তার সেই আঁ-আঁ-ড় ডাক শুনে অন্য বাথানের মাদিমোষ, বাচ্চামোষ, এমনকী বুনোমমাষের বাচ্চাও তাদের দলের কাছে আসত। আর কখনো কখনো তাদের গলায় দড়ি দিয়ে সরে পড়ত তাদের দল।

তা, দেখো কমরুন, আসফাক মনে মনে বলল যেন, এখনো জাফরুল্লার বাথানে গর্ভবতী মোষ আছে। সে রকম একটাকে পেলে ধীরে ধীরে একটা

মোষের দল গড়ে তোলা যায় বটে। আর তাহলে সেই মোষের দলকে অবলম্বন করে দুটো মানুষ থেকে ক্রমশ এক ঝাক বাউদিয়ার এক দলও হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা তুমি তখন বলোনি। বললে তিন সাল বাদে। তখন, যখন বুড়ি মোষটা মরল আর আমরা মহিষকুড়ার খামারে, আর বৃষ্টিবাদলে বন ভিজে গিয়েছে, আর জাফরুল্লার মধ্যে তুমি তোমার পুরনো দলপতিকে খুঁজে পেয়েছিলে, বোধহয় আমিও ভেবেছিলাম এটাই ঠিক হল।

আসফাকের বাইরের অন্ধকার যেন একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানিতে চিড় খেল। আর সেই চিড়-খাওয়া ফাটল দিয়ে বিবিদের ঝগড়ার কথাগুলো ভেসে উঠল। মেজবিবির সঙ্গে ছোটবিবির ঝগড়া। ঝগড়াটা ঠিক নয়। ঝগড়ায় সংবাদ ছিল। ছোটবিবি, মেজবিবি, বড়বিবি, এমনকী মুন্নাফের পর থেকে কমরুনবিবিও পতিত থাকে কেন?

আর তা যদি হয়? সে জন্যই কি মুন্নাফ তার নাম ধরে ডাকে না? আর কমরুন তাকে শিখিয়ে দিয়েছে সম্মান করতে?

অদ্ভুত কথা তো! ভারি অদ্ভুত কথা। এ ছাড়া কোনো কথাই আসফাকের মন। তৈরি করতে পারল না। কমরুন কি বুঝেছিল সেই বর্ষায় ক্রমশ তার বিপদ বাড়বে, যে বিপদে তখনকার সেই এককুড়িতে না-পৌঁছানো আসফাক থই পেত না? বরং বুড়ো, হেঁড়েমাথা একবুক-দাড়ি জাফরকে ভরসা করা যায়? আর চালাক, হাড়-চাল্লাক জাফরও কি কমরুনের অবস্থা ধরতে পেরেছিল? অদ্ভুত কথা তো! আসফাক অনেকদূর থেকে ভেসে আসা কমরুনের কথা শুনতে পেল। এখন মনে হচ্ছে কথাটা দামি। তখন নিজের মনের দুঃখে দামই দেয়নি সে। কমরুন বলেছিল বোধহয়, এ ভালোই হয়।

আসফাকের মনে কথা তৈরি হচ্ছে না। আর কথা তৈরি না হলে চিন্তাও করা যায় না।

.

ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল আসফাকের। ধড়মড় করে সে উঠে বসল। তার আদৌভালো ঘুম হয়নি। একবার তার মনে হয়েছিল, হাঁক মারতে মারতে একটা কালো মোষ এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারিঘরের সামনে। দ্বারিঘরের চাল ছেয়ে এত উঁচু, আর আগুনের মালসার মতো চোখ। আর তখন সে যেন নতুন এঁড়ে মোষের, মতো ভয়ে ভয়ে এই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। সেটা কি স্বপ্ন? না চোখেও দেখেছিল সে?

সজাগ হল আসফাক। এখন দিনের আলোই চারিদিকে। এটা সেই বলদের ঘরই। ঘুম ভাঙতে খুব দেরি হয়েছে তার। এমন আলো ফোঁটার আগেই বলদ ছেড়ে দেয়ার কথা।

তা, কমরুন, ভাবল আসফাক, আসল কথা বাথানে গাবতান মোষ থাকতে পারে কিন্তু বন কোথায় আর? চাউটিয়া যা বলে, বড়বিবি যা বলে, তা মানাই ভালো। এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, একহাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কী? এখন বোঝা যাচ্ছে, গাবতান মোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হত না।

.

বলদগুলোকে এক এক করে খুলে দিল আসফাক।বলদের ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বার করে শুনল, অনেক লোক কথা বলছে, হাঁকডাক উঠেছে। একজন কে তার নাম ধরে ডাকল।

ঠিক যেন জাফরুল্লাই, তেমন কর্কশ করে কেউ তাকে ডাকছে। মাচার উপরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সকালের দিকে বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল তার। এই হাঁকডাক, ডাকাডাকিতেই তার ঘুম ভেঙেছে। অনেক বেলা হয়ে গেলে চাকররা যেমন করে, তেমন চোখ ডলতে ডলতে সে বলদঘরের দরজার কাছে এল।

কিন্তু জাফরুল্লা নয়। মুন্নাফ ডাকছে। তাকে খুঁজছে বোধহয় অন্য চাকরদের মধ্যে। না পেয়ে এদিকে আসছে। বেলা একটু হয়েছে। কিন্তু যতটা আশঙ্কা করেছিল তা নয়।

মুন্নাফ বলল, উঠছ আসফাক?

উঠলাম। কখন আইসলেন তোমরা? আসফাক বিবর্ণ মুখে হাসল।

ভোর-রাইতৎ।

কেন, শহর থাকি রাইতৎ রওনা দিছিলেন? অন্ধকারের পথ তো!

লরিৎ আসলাম। তা দেখো নাই? আব্বাজান লরি কিনছে একখান। তারই বাদে শহরৎ গেইছং।

অ।

এখন থাকি গরুগাড়ি তামাক পাট যাইবে না বন্দর। লরিৎ যাইবে। কী ভকং ভকং হরন, আর কত্ত বড় বড় চাকা। ডারাইবারও আসছে।

অ। তা, মুন্নাফ—

শোনো, তোমাক এক কথা কই, আসফাক। বলদ এড়ে দ্যাও। আব্বাজানের ঘুম ভাঙার আগৎ বলদ ধরি দূরৎ যান। আম্মা কয়া দিছে।

বলদের পিছনে বেরিয়ে যেতে যেতে পেন্টি লাঠি হাতে নিল আসফাক, গামছাটা কাঁধে ফেলল।

মুন্নাফ দরজার কাছ থেকে কিছু দূরে সরে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডেকে বলল, শোনো, আসফাক, আর এক কথা কই।

আসফাক এগিয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে কী একটা ধকধক করছে, উথাল-পাথাল করছে। জাফরুল্লা এসে গেছে, জাফরুল্লা এসে গেছে। নাকি এটা আবার সেই ভুলুয়ার হাতে পড়ার অবস্থা হতে চলেছে? কেমন যেন জটিল লাগছে নিজের মনকে তার। আর মুন্নাফের সুন্দর মুখটাকে দেখো।

আম্মা কইছে, মুন্নাফ বলল, আব্বাজান খাওয়া-লওয়া করি শুতি না গেইলে তুমি বাড়ি আসবা না।

আসফাকের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। একটু ইতস্তত করল সে। কথাটা কী ভাবে আরম্ভ করা যায় তা খুঁজতে দেরি হল।

কেন, মুন্নাফ তোমরা নোক্ আর মিঞাসাহেব না কন?

মুন্নাফের মুখে লজ্জার মতো কিছু একটা দেখা দিল। না, আব্বা কয়, চাকরক তা কওয়া লাগে না।

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ডাকল-আসফাক।

কে যেন কয়? চিনতে কি ভুল হয়? এই বজ্রগর্জনের মতো স্বর! খোলা জানালায় মেহেদি-রাঙানো দাড়ির খানিকটা দেখা গেল।

আসফাক দ্বারিঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল, দৌড়ে চলার মতো হাত পা নেড়ে। বজ্রটা ফাটল না। হাসির মতো লাগল শুনতে, আকাশের চেহারা ভাল নোয়ায়, আসফাক। বলক দূরৎ না-নিস। হেই বলদ।

আকাশের দিকে তাকাল আসফাক। আকাশে কালো মেঘ নেই। দিনের আলোয় যে আকাশ ঝকমক করে, তাও নয়। এমন নোংরা আকাশ সে কোনোদিনই দেখেনি।

দ্বারিঘরের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বাপ্প! বলল সে মনে মনে। আর অবাক হয়ে থেমে গেল। চাকর, আধিয়ার, গ্রামের মানুষদের ভিড়ের মধ্যে সে এক প্রকাণ্ড গাড়ি। মানুষের কাধ সমান উঁচু উঁচু চাকা। কুচকুচে কালো রং।

চিবুকে হাত দিয়ে সে ভাবল এটাকেই কি তা হলে সে বুনো মর্দা ভেবেছিল রাত্রিতে! নাকি স্বপ্নই ছিল সেটা?

আসফাক অবশ্যই জানত না, ঘুমের ঘোরে দেখা বস্তু স্বপ্নে অন্য রূপ নিতে পারে যদি চিন্তার যোগ থাকে।

সে বলদের পিছনে যেতে যেতে মন্তব্য করল, বাব্বা ইয়ার সাথৎ কাঁউ পারে?

সে বলতে চায়, এই কলের মোষের সঙ্গে কোনো মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না। সে যত দেখল, তত অবাক হয়ে গেল।

.

অনেক বেলায় সে খামারমুখো হল। পথে দেখা হল সাত্তারের সঙ্গে, সে স্নান করে খেতে যাবে বলে খামারে চলেছে। আসফাক জিজ্ঞাসা করল, এত্ত দেরি?

সাত্তার বলল, শহর থেকে সেই ভোটবাবু পাট্টির লোকরা ফিরছে অনেক। খুব খাওয়া-দাওয়া ধুম-ধাড়ো । রাত্তিরেই হরিণ মারছে একটা।

কেন সাত্তার?

তোমরা শোনো নাই? ব্যাপারি পঞ্চায়েত পিধান হইছে।

সাত্তার চলে গেল।

আসফাক ট্রাকটার সামনে দাঁড়াল। লেল্যান্ডের ট্রাক। চারিদিকেই একমানুষ দেয়াল তোলা। সে জন্যই সাধারণ ট্রাকের দ্বিগুণ দেখায়। দ্বারিঘরে অনেক লোকের ভিড়। কিন্তু এপাশে দাঁড়ালে চোখে পড়বে না বোধহয়-এই ভেবে ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ভয়ে ভয়ে ট্রাকটার গায়ে একবার হাত ছোঁয়াল।

পঞ্চায়েত পিধান কথাটা তার অজানা নয়। ভোটবাবুরা, এমনকী সেই হাকিমও আশ্বাস দিয়েছিল, এই নির্বাচন হলে গ্রামে আর জমিজিরাত নিয়ে অন্যায় থাকবে না।

আসফাক ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলবে যেন! দেখো কাণ্ড, সেই জাফরই হল পঞ্চায়েত পিধান যার নামে সে হাকিমকে নালিশ করতে গিয়েছিল।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়।

এতক্ষণে কি জাফর স্নান-আহার শেষ করে ইচ্ছামতো বিবির ঘরে ঘুমিয়েছে? আসফাককে তো স্নান-আহার করতে হবে।

.

কেননা, এ তো বোঝা যাচ্ছে, সব বনই কারো না কারো, যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড়-মোষ হতে পারো, কিন্তু বন আর বনের নয়, তাও অন্য একজনের।

আর, এই কথাটাই মনে পড়ছে আসকাফের বলদগুলোকে খোঁটায় বাঁধতে বাঁধতে–সেই যে এক সাহেব গল্প করেছিল, কোচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইসন-মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর আর বুনো মর্দামোষ

কারো চোখে পড়েনি। এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন। এ তো বোঝাই যাচ্ছে, শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামতো বনে চরতে আর কোনোদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে।

একটি খামারের গল্প

জাফরুল্লা ব্যাপারির খামারে এখন সকাল হচ্ছে। তার উঁচু ডারিঘরের ছাদের ওদিকে যদি আকাশে এখনো কোনো রং থাকে তবে এদিক থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বড়জোর একফালি মরচে ধরা মেঘ দেখা যাচ্ছে।

আসফাক উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলদগুলোর পিঠের উপর দিয়ে দিনের আলোর খোঁজ করছিল। আলো দেখতেই সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল যেন ঘুম থেকে। তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হল কারণ কেউ দেখল না, ছমির পর্যন্ত ধারেকাছে ছিল না। আসলে সে আদৌ ঘুমোয়নি, এবং তার রাত্রির আশ্রয় এই বলদদের ঘরে সে ভোর-ভোর সময়ে এসে ঢুকেছে।

এই বড় চালাঘরটার জাফরুল্লার ছ জোড়া বলদ থাকে। তার একপাশে এক মাচায় ঘুমোয় আসফাক। তাকে উঠতে দেখে বলদগুলোও উঠে দাঁড়াল। রাত্রির জড়তা কাটিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করল। বাষ্পে যেন ঘরটা ভরে গেল। আর তার মধ্যে দিয়ে মুখ বার করল আসফাক। বছর ত্রিশেক বয়স হবে তার। রোগা লম্বাটে চেহারা। চোখদুটো এত ভাসাভাসা যে মনে হয় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চিবুকে গোটা দশ-পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ করছে।

আসফাক যেন অবাক হয়েই চারিদিকে চাইতে লাগল। ডারিঘরের একটা জানালা খোলা। তার সামনে ধানমাড়াইয়ের ঘাস-চাঁছা মাটি, যার বাঁদিকে ধানের মরাই আর ডানদিকে বলদদের ঘর যে ঘরে আসফাক শোয়। ধানের মরাইয়ের পিছনে খড়ের মঠ আকাশের গায়ে ঠেকেছে। মঠের মাথায় শিমুলগাছের ডাল। তার উপরে একটা পাখি বসে আছে। অত উঁচুতে, পাখিটাকে ছোট দেখাচ্ছে। তাদের দেশে এমন সব মঠের মাঝখানে থাকে বাঁশ। এখানে শিমুলগাছটা বাড়ছে, মঠও উঁচু হচ্ছে। ধানমাড়াইয়ের মাটির যে দিকে ডারিঘর তার বিপরীত দিকে টিনের দেয়ালের সেই ঘর যার একপাশে তামাকের গুদাম, অন্যপাশে জাফরুল্লার প্রকাণ্ড সেই সিন্দুক-খাট। এই খাটেই থাকে জাফরুল্লা। বিস্মিতের মতো দেখতে লাগল আসফাক। অথচ । এমন পরিচিতই বা কী তার–সাত বছর হল, দশ হতে তিন বাদ।

এমন সময়ে কে যেন খুক করে কাশল। আসফাক চমকে উঠে কাছিম যেমন খোলায় গলা ঢুকিয়ে নেয় তেমনি করে সরে গেল দরজা থেকে। জাফরুল্লার টিনের দেয়ালের শোয়ার ঘরের দিকে চাইল। না সেদিকে কোনো জানালা খোলেনি। বরং ছমিরই আসছে।

তখন তার মনে পড়ল এতক্ষণ সারারাত ঘুমিয়ে এইমাত্র ওঠার যে অভিনয় করার চেষ্টা করছিল সে তার কোনো মানে হয় না। কারণ ছমির দেখেছে

তাকে ফিরে আসতে। সে যতই চেষ্টা করুক ছমিরের নিশ্চয়ই মনে থাকবে আসফাক সন্ধ্যায় না ফিরে রাত শেষ করে ফিরেছে।

ভোর-ভোর রাতের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল তার।

ডারিঘর পর্যন্ত এসে সে তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে কোন সাহসে এগিয়েছে তা যেন খুঁজেই পেল না। অন্ধকার ছিল বলেই বোধহয় সাহস।

এগোবে, না পিছোবে ভাবছে সে, এমন সময়ে একজন বেরিয়ে এল অন্দরের দিক থেকে। হাতে পাটকাঠির মশাল।

আসফাক এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

কে?

আসফাক।

আসফাক?

জে।

জে না। আমি ছমির। আসলা?

একটা অবসন্নতায় তার শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল। টলতে টলতেই যেন সে বলদদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছমির ডারিঘরের ভিতরের দিকের বারান্দায় তামাক সাজতে বসল। কী করবে এখন আসফাক? রোজ সকালে যেমন বলদগুলোকে খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তেমন কিছু করবে!

এতে আর সন্দেহ নেই যে এবারেও ব্যাপারটা বোকামিই হয়ে গিয়েছে। অথচ তখন সেটাকেই একবার ঠিক কিছু বলে মনে হয়েছিল।

আর এ সবের জন্য সে হকিমবাবুই দায়ী। সরকারি কর্মচারী। রাজ বদলেছে। গল্পে শোনা রানীর আমল তো আর ফেরেনি। তাই বলে সরকারি কর্মচারীরা তো আর বদলায় না। বিশেষ করে তার হাকিমের মতো পোশাক। টুপি পর্যন্ত ছিল।

সেই হাকিমই দায়ী কিন্তু, এই স্থির করল আসফাক। জাফরুল্লা ব্যাপারির দ্বারিঘরে সে বসেছিল দপ্তর বিছিয়ে। গ্রামের অনেক লোকই গিয়েছিল তার সঙ্গে দরবার করতে। দুদিন ধরেই চলছে। অন্তত তাই ধারণা হয়েছিল আসফাকের। তাদের অনেকের অনেক অভিযোগ কর্মচারীটি শুনেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাগজেও টুকে নিচ্ছিল। আর এসবই শুনতে পেয়েছিল আসফাক সেই ঘরের দাওয়ায় বসে তামাকের গুঁড়োয় গুড় মিশিয়ে ছিলিমের উপযুক্ত তামাক বানাতে বানাতে। তারপর অবশেষে জাফর খেতে গেল। এমনকী তার অন্য চাকররাও। তখন এদিক ওদিক

চেয়ে আসফাক হাকিমের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে নেংটি। হাত দুখানা চিটেগুড় আর তামাকের গুঁড়োয় কালো।

হাকিম বলেছিল, কী চাও?

জে। আসফাক ঘরের আসবাব পর্যবেক্ষণ করল যেন।

কী দরকার তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

জে।

আসফাক বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না।

হাকিম উঠে দাঁড়াল। তার তখন বিশ্রামের সময়। সেই ঘরেই তার বিছানা পাতা। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিকে দশখানা গাঁয়ের মধ্যে জাফর ব্যাপারির মতো ধনী কেউ নেই, লোকে অবশ্য বলে অমন মেহেদি-রাঙানো দাড়িও না, শহরের হাকিমরা এলে জাফর ব্যাপারির এ দ্বারিঘরেই থাকে। টিনের ছাদ কাঠের দেয়াল। যেন ডাকবাংলোর মতোই সাজানো।

হাকিম চেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। যেন ঘরে আর কেউই নেই। তারপর পাশ ফিরে যেন আসফাককে দেখতে পেল।

কী, যাওনি? এখানেই চাকরি করো?

জে।

কত টাকা পাও?

তিনটাকা।

বলো কী! খেতে পরতে দেয়?

জে।

তিনটাকা। হাকিম হাসল। বলি মাইনা টাইনা পাচ্ছ তো?

না।

না?

জে।

হাকিম আবার হাসল। কতদিন পাও না?

দশ সাল।

হাকিম হো হো করে হেসে উঠল। এই অদ্ভুত কথা শুনে এবং আসফাককে দেখে তার খুব মজা লেগেছে সন্দেহ নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কার চাকর? জাফর ব্যাপারির?

আসফাকের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। সে নিজের বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্যও কম হয়নি। সে ভেবে উঠতেই পারল না এমন নালিশ সে কী করে সাজিয়ে গুছিয়ে করতে পারল। কারণ হাকিমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কতটুকু উচ্চারণ করেছিল আর কতটুকু চিন্তা করেছিল সে হিসেব করার চাইতে অনেক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে তখন। বরং যা উচ্চারণ করেনি সে কথাগুলোকেই স্পষ্ট করে বলেছে এমন অনুভব করছিল সে তখন। নতুবা তিনটাকা মাইনা দশ বছর না পাওয়াটা কথা নয়। বরং শুধু সেটা বললে মিথ্যা নালিশ হয়ে যাবে। মাইনা বন্ধ আছে হয়তো তিন সাল এবং তা আসফাক চায়নি বলেই। নালিশ হল অব্যক্ত মনের কথা, অনেক কথা। প্রথম এসে দশবিঘা জমি পেয়েছিল সে চাষ করতে। কিন্তু সে জমিতে খোরাকির ধান ফলাতে পারত না। সে জমি কি ধান ফলানোর? জাফরুল্লাকে বখরা দেওয়ার পর যা থাকত তাতে ছমাসের খোরাক হত। বাকি ছ মাসের ধান সে ধার নিত আর ধান উঠলে ন মণ দিয়ে ধার শোধ করত। কিন্তু নমণ দিলে ছ মাসের খোরাকও থাকে না। ডাঙা জমি। জমির বিরুদ্ধেও নালিশ করেছে সে মনে মনে। তারপর একদিন জাফরুল্লা তার খাওয়াপরার ভার নিল। কেমন যেন কিসের একটা টানে টানে সেখানে পৌঁছাল আসফাক। আর খাওয়াপরা ছাড়া তিনটাকা মাসমাইনার কথা নিজেই প্রস্তাব করেছিল সে। হাকিমকে কি এসব কথাও সাজিয়ে গুছিয়ে সে বলেনি!

হাকিমের সম্মুখ থেকে চলে আসতে আসতে আসফাক নিজেকে অদ্ভুত রকমে ভারমুক্ত মনে করল। এসব নালিশ শুনলে গ্রামের লোকে ঠাট্টা করতে পারে। অবশ্য গত দশ বছরে কি একবারও সে নালিশ করেছে? হাকিমও হেসেছে বলতে পারো। তা হলেও

কী অদ্ভুত কাণ্ড! দুপুরে আসফাক সেদিন খেতেই পারল না। তারও আগে ঝোরায় স্নান করতে গিয়ে উত্তেজনায় যেন তার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। স্নান করে ভিজে গায়েই খানিকটা সময় সে ঝোরার পার ধরে দুপুর-রোদ মাথায় ঘুরে বেড়াল। অদ্ভুত একটা শক্ত কাজ করে বসেছে। তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল তখন। হাকিমকে কিনা সব বলে দিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ তার গা ছমছম করে উঠেছিল। হাকিম সাহেব কি ব্যাপারিকে সব বলে দেবে? এতক্ষণ বলেও দিয়েছে হয়তো। তা হলে?

প্রায় বিকেল হলে আসফাক ফিরেছিল ব্যাপারির বাড়িতে সেদিন। তখন আগুই ধান মাড়াই করছে ব্যাপারির অন্য চাকররা দ্বারিঘরের সামনের চত্বরে। তারা যেন আসফাককে দেখেও দেখতে পেল না। আসফাক এদিক ওদিক চেয়ে ব্যাপারিকে খুঁজল। তাকেও দেখতে পেল না। একথা সব চাকরই জানে যে আসফাক বিকেলে যদি কিছু কাজ করে তবে তা জাফরুল্লার তামাক সাজা আর দড়ি পাকানো। তখন চাকররাও ছিলিম পেয়ে থাকে তার কাছে চাইলে। কিন্তু সেদিন যেন কেউ তা চাইছে না।

চারিদিক থমথম করছে। বাতাসও চলছে না। খড়ের উপরে বলদগুলো চলছে তারই শব্দ কানে আসছে। আর মাথার উপরে মশা ওড়ার শব্দ।

এমন সময়ে মুন্নাফ বেরিয়ে এসেছিল অন্দর থেকে। মুন্নাফকে কে না চেনে এ গেৰ্‌দে? জাফরুল্লা ব্যাপারির একমাত্র ছেলে। তার চার নম্বর বিবির। দরুন চার বিবির ওই এক সন্তান।

সে এসে খুঁজল এদিক ওদিক চেয়ে। তারপর আসফাককে দেখে তার দিকে এগিয়ে এল। আর তখন দু পা পিছিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল আসফাক।

এই যে মিঞাসাহেব, শোনো। আব্বাজানের ওষুধ ফুরায়ে গিছে, সলসবাড়ি যাওয়া লাগে।

আসফাক ধীরে ধীরে বলেছিল, সল্লাবাড়ি?

হ্যাঁ, পিরহান পরে আসো।

আসফাক সেই বলদদের ঘরে গিয়ে দেয়ালে গোঁজা জামাটা ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিয়ে এসেছিল। আর মুন্নাফ তাকে খুচরোয় আর নোটে মিলিয়ে আট-দশটা টাকা এনে দিয়েছিল আর একখানা কাগজ। সলসলাবাড়ির দোকানটাও চেনা। কাগজ দেখালেই ওষুধ দেবে।

আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল।

ব্যাপারির বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ খুব তাড়াতাড়ি এসেছিল আসফাক। ওষুধ যা কিনা মানুষের চূড়ান্ত বিপদের সময় লাগে। ব্যাপারির বয়স হয়েছে, তিন কুড়ির কম নয়। আজকাল কঠিন কঠিন অসুখ হয়। কয়েকমাস আগেই একবার শহর থেকে ডাক্তার এসেছিল। যাওয়া-আসার। মোটরভাভা দুশো টাকা নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার। তা এমনটাই মানায় জাফরকে। এখনো আটশো বিঘা জমি তার–তার পাঁচশো বিঘাই একলপ্তে শালমারির বনের সীমা পর্যন্ত।

আসফাক তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করেছিল কিন্তু সলসলাবাড়ি যখন কাছে এসে পড়েছে পথের উপরে হঠাৎ সে থেমে দাঁড়াল। অভ্যাসমতো কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন চলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা অস্বস্তির মতো কিছু মনে দেখা দিল। কিছু ভুলে গেলে যেমন হয়। তারপর সেই অস্বস্তিটাই যেন উষ্ণ হয়ে উঠল। আর আসফাকের মনে পড়ল হাকিমঘটিত ব্যাপারটা। আজ যা সে করে ফেলেছে তার তুলনা তার নিজের জীবনে নেই। কিন্তু ঠিক সে কথাই নয়। অন্য আরো কিছু, যা আরো উষ্ণ। এই চিন্তাগুলোই যেন তার গতিকে শ্লথ করে দিল। যেখানে সে তখন পৌঁছেছিল সেখান থেকে দুটো পথে সলসলাবাড়ি যাওয়া যায়। একটা পথ সোজা গিয়ে উঠেছে। হাটখোলায় যেখানে ওষুধের দোকান। অন্যটা সলসলাবাড়ির পশ্চিমে গিয়ে উঠেছে। প্রথমটি আলের পথ, দ্বিতীয়টি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের।

আসফাক নিজেকে যুক্তি দিয়েছিল–পথ তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের, আলের পথ তো গ্রামের লোকের মনগড়া কিছু। ও পথেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেবার যে ডাক্তার এসেছিল সেও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পথে।

আসফাকের মনে হল একবার একটু জিরিয়ে নিলে হয়। ওষুধ আনতে বলেছে তাই কি মানুষ জিরোবে না। প্রায় পাঁচ মাইল পথ সে হেঁটে এসেছে। আলোর পথে তিন মাইল হত হয়তো। জিরিয়ে নিতে তখন সে একটা গাছতলায় বসেছিল। সলসলাবাড়ির বন্দরে যখন সে ঢুকল তারপরে তখন সন্ধ্যা পার হয়েছে। এরকম সময়ে তার মনে একটা কথা উঠল : দেরি হয়ে যাচ্ছে না? ওষুধ আনার ব্যাপার তো। আসফাক এই কথাটা শুনেই ওষুধের দোকানের দিকে না গিয়ে অন্য এক দোকানের সামনে বসে পড়েছিল। সেখানে বসেও অনেক দেরি করে ফেলেছিল। আর দেরি করতে পারার আনন্দেই খুঁতখুঁত করে হেসেছিল সে।

আসফাক দেরি করে ফেলেছে। কাজের ভার নিয়ে এমন দেরি করতে পারে সে–এ তার সম্বন্ধে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। ফিরেই তো এসেছে সে। এরকম বোকামি তার নতুনও নয়।

সেই সেবারের কথা। ব্যাপারটা ঘটবে আগেই জানা ছিল। অনেকেই বলেছিল তাকে। সংসারে থাকার মধ্যে ছিল তার বাবা আর মা। মার বয়স অনেক হয়েছিল। চুলগুলো ছিল শণের নুড়ি, আর চোখেও সে ঝাপসা দেখত। কাজেই তার মৃত্যু ঘটার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। কিন্তু তার বাবা জোয়ানই ছিল বলতে হবে। চুলও পাকেনি। অথচ মায়ের মৃত্যুর দু-চার সপ্তাহের মধ্যেই তারও মৃত্যু হল। তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল অঘটন কিছু ঘটবেই। বাড়ি বলতে একখানা চৌরী খড়ের ঘর যার বারান্দায় রান্না হত; অন্য আর একখানা ঘর ছিল যার বেড়া ছিল ফাটানো বাঁশের, আর ছাদ ছিল খড়ের চালা। এই ঘরে একটা নড়বড়ে মই, একটা লাঙল থাকত এক কোণে। কিছু দড়িদড়া থাকত। অন্যদিকে থাকত একটি বুড়ো বলদ যার পিঠে একটা পাকাঁপোক্ত রকমের ঘা হয়েছিল। ছবিঘা জমি চষত আসফাকের বাবা। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পরই আসফাক শুনতে পাচ্ছিল এবার নতুন আধিয়ার আসবে। এই ছবিঘা জমিতে সে সোনা ফলাবে। ও আর আসফাকের কর্ম নয়। কী বলিস আসফাক? আসফাক হেসে বলত–হেঁ। আসফাক নিজেই জানত সে বোকা। লোকের মুখে শুনে শুনে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের কারণই দেখতে পেত না সে। কাজেই খড়ের ওই চৌরীখানা যে ছাড়তে হবে এ বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু এত সব জেনেও কী হল। সেই সকালে নতুন চাষি যখন বাড়ি দখল নিতে এল তখন কার কাছে দখল নেবে তা খুঁজে পেল না। কারণ গোয়ালঘরের চালার নীচে পাট-তামাক রাখার জন্য আসফাকের বাবা যে বাঁশের টোং-মাচা বেঁধেছিল সেখানে লুকিয়ে আসফাক তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। গরমে যত ঘামছে তার চাইতে ভয়েই বেশি। চোখ বন্ধ

করে সে সেখানে পড়েছিল একটা দিন একটা রাত্রি। অথচ কী ছিল ভয়ের? নতুন বর্গাদার তো আদালতের পেয়াদা নয়, পুলিশও নয়।

আসফাক এখন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। এটাই তার রোগ; পরে সে ঠিক বুঝতে পারে, কিন্তু যখন বোঝা দরকার তখন যেন সব গুলিয়ে যায়। সে লোকের মুখেও শুনেছে যেটা আগে হওয়া দরকার সেটা তার বেলায় সময় পার করে দিয়ে–যেমন কথা বলতে শেখা।

এখন ছমিরের মনোভাবটা বোঝা দরকার। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার এই দেরি করার ফলে তা কিছুটা বোঝা যাবে। সে ছমিরের দিকে এগোতে যাচ্ছিল। পিছিয়ে আসতে হল তাকে, কে যেন জাফরুল্লার ঘরের জানালাটা খুলছে। জানালাটা খুলল কিন্তু কিছুই ঘটল না।

এমন বিস্ময় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, এই কিছু না ঘটা। আসফাক এবার সত্যি বিস্মিত হল। এতক্ষণেও এটা তার নজরে পড়েনি! এর মধ্যে জাফরুল্লার দুছিলিম তামাক পুড়ে যায়। আসফাককেই দিতে হয় ঠিক করে। সে না থাকলে ছমির দিতে পারত। কিন্তু দেখো ছিলিম ধরিয়ে নিজেই টানছে ছমির।

তাহলে? তা হলে কি ব্যারামের মুখে ওষুধ না পেয়ে জাফরুল্লা–(বাক্যটা চিন্তাতেও শেষ করতে পারল না সে)। স্তম্ভিত আসফাক চিবুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তার দেরি করার এই ফল দেখে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে ছমিরের দিকে।

মৃদু স্বরে সে বলল, তা, ছমির, ব্যাপারি?

ব্যাপারি শহরে, মুন্নাফও।

ছমির ছিলিমে সুখটান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলেও গেল।

আসফাক বসে পড়ল। অবসন্নতায় শরীর যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাত্রিতে ঘুম হয়নি। কাল দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আর ভয়–যা এইমাত্র চূড়ান্ত একটা ধাক্কা দিয়েছে তাকে।

কিন্তু এটার একটা ভালো দিকও আছে। খানিকটা সময় পাওয়া গেল। বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধি এল আসফাকের মাথায়। বুদ্ধিটাকে আর একটু পাকা করে নেয়ার জন্য নতুন করে ছিলিম ধরিয়ে নিল সে। অবশেষে স্থির করল–ছমির বা অন্য কোনো চাকর হয়তো এখনো ব্যাপারটা সবটুকু বোঝেনি। সময়মতো ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে এটা কৈফিয়ত হিসেবে দাঁড় করানো যায় কিনা দেখতে হবে। দেরি হয়নি ফিরতে, ঘুমই দায়ী।

রোজকার মতো কাজ শুরু করল সে। সেটাই কৌশল হিসাবে ভালো হবে। বলদগুলোকে ছেড়ে দিল। অন্যান্য দিনের মতো হেইহাই করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। না তাড়ালে খড়ের মঠে মুখ দেবে।

.

খামার থেকে কিছু দূরে এক চিলতে বন আছে। এক চিলতে বনই বটে, ত্রিশ-চল্লিশটা শালগাছ। এই বনের পাশ দিয়ে নদী। নদীর ওপারে কাশের ঝোপ একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। নদীতে একহাঁটু জল। এপার থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওপারে গিয়ে পড়ে। কিন্তু স্রোত আছে। জলটাও ঘোলা। এই নদীর জল সব জায়গাতে একরকম নয়। সলসলাবাড়ির পশ্চিমে এর জল স্বচ্ছ। পাথরের কুচি মিশানো বালির খাত–অনেকটা চওড়া কিন্তু শুকনো। তার উপর দিয়ে অনেকগুলো ধারায় তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আসফাক সেখান থেকে সিকি মাইল গেলে ব্যাপারির দহজাফরুল্লার নাম থেকেই নাম। সেখানে জলটা বেশ গভীর। জলের রংও প্রায় নীল। আর তার পাশেই জাফরুল্লার খামারবাড়ি। নদী সম্বন্ধে এই দার্শনিক আলোচনা করে আসফাক আবার খামারের দিকে ফিরে গেল।

তার তখন মনে হল–যাই হোক, ছমির কী ভাবছে তা এখনো বোঝা যায়নি। এবং এটা মনে হতেই তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঠোকটা পার হতেই সে দেখতে পেল ঝোরার ধার ঘেঁষে একটা জমিতে চাষ দিচ্ছে। কয়েকজন কৃষাণ। জলবৃষ্টি নেই অথচ জমিটা যেন জলে টইটম্বুর। আসফাক বুঝতে পারল হেঁউতির বীজ দেয়া হবে। হ্যাঁ, ছমিরও আছে ওদের মধ্যে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে কি কথাটা বলা যাবে? বরং অন্য সময়ে। বলদগুলোর ঘরটা এখনো সাফ করা হয়নি। আসফাক ফিরে গিয়ে ঝুড়ি করে গোবর ফেলতে শুরু করল। যেখানে সেখানে ফেললে চলবে না। হয় খামারের পিছনে উঁইতে জমা করতে হবে, কিংবা তামাকের খেতে। অন্যদিনের চাইতে বেশি মন দিয়ে সাফ করলেও ঘরটা সাফ করতে খুব সময় লাগল না। আর তারপরেই আবার তার ছমিরের কথা মনে হল। আশ্চর্য, ছমির নিজে থেকে কিছুই বলছে না।

ডারিঘরের বারান্দা থেকে ছিলিম নিল আসফাক, বেশ বড় একদল তামাক। খড়ের নুড়ো পাকানো ছিল। তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে কৃষাণরা যেখানে চাষ দিচ্ছে সেদিকে গেল সে।

সেখানে পৌঁছে আলের উপরে বসে ছিলিম ভরল আসফাক। নুড়ো ভেঙে আগুন ধরাল তামাকে। তখন একজন করে কৃষাণ আসতে লাগল হাল ছেড়ে রেখে। তিনটে হাল চলছে। ছমির ছাড়া আরো দুজন। নসির আর সাত্তার। সবশেষে ছমির এল। ছিলিম নতুন করে ভরল আসফাক। তার হাতে ছিলিম তুলে দিয়ে সে নিঃশব্দে ছমিরের দিকে চেয়ে রইল। ছমিরও নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল।

অবশেষে আসফাক বলল, কেন, জমির হেঁউতি?

তা না তো কী?

আর কেউ চাষ দেয় না কিন্তুক। জল ঝরি নাই।

ছমির ছিলিমটা ফিরিয়ে দিল আসফাককে।

কেন, ছমির–?

কী?

না। তাই কই।

ছমির আল থেকে নেমে গিয়ে আবার লাঙল ধরল। চাষিদের পা কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বলদগুলোরও সেই অবস্থা। নদী থেকে জল তুলে এই কাদা করা হয়েছে।

কিন্তু ছমির এবারও কথা বলল না। তা হলে তার ফিরতে কত দেরি হয়েছে তা কি জানে না ছমির?

জানে, নিশ্চয়ই জানে। দম মেরে আছে। ব্যাপারি ফিরলে লাগাবে। সাতখানা করে।

আসফাকের হাতে তামাকটা বৃথা পুড়তে লাগল। লাগাবেই বা কী ছমির? ব্যাপারি শহরে যাওয়ার আগে কি জেনে যায়নি নিজেই।

হঠাৎ কথাটা মনে এল। সে কি ইতিমধ্যে এদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছে? সে একটা গল্প শুনেছে ইতিপূর্বে দাগি আসামীদের নাকি এরকম হয়। তার নিজের গ্রামের লোকরাও কথা বলে না। বললেও তা না-বলার শামিল। অথচ দেখো ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে পর পর একই রেখায় হাল চালাতে চালাতে। সাত্তার হাসলও যেন একবার কিছু বলে। আসফাক কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো, সে যে বসে আছে এখানে তা যেন ওরা দেখছে না। অনেকক্ষণ ধরে আসফাক ওদের আলাপের পরিধিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াল যেন। সে যেন দলে ঢুকে পড়তে চায়, আর ওরা তাকে দলে নেবে না স্থির করেছে।

শেষে আসফাক বলল, বুঝলা না?

কিন্তু ওরা যেন শুনতেই পেল না।

দ্বিতীয়বারও সে প্রায় চিৎকার করেই বলল, বুঝলা না?

এবার সাত্তার বলল, কও?

হ্যাঁ। বুঝলা না, আসফাক বলল, কাল ভুলুয়া না কী বলে তাই লাগছিল।

সাত্তার হাল ধরে ততক্ষণে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে। সেখান থেকেই বলল, তা লাগে অনেক সময়।

আসফাক বলল, সন্ধে থেকে দুপুররাত–শেষে দেখি শালমারির বনে চলে গেছি।

এবার নসির দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুলুয়া অপদেবতা, যে নাকি মানুষকে পথ ভুলিয়ে মারে। নসিরের বয়স হয়েছে। শুনে সে অবাকও হল। নসির বলল, শুনছ না, সাত্তার! আসফাক কয় ভুলুয়া লাগছিল পাছে। কোথায় গিছলা, আসফাক?

সল্লাবাড়ি।

সলসলাবাড়ি? নসির কথাটা যেন ভালো করে জেনে নিল।

সলসলাবাড়ি? সাত্তার বলল, ও সেই, ব্যাপারির ওষুধ আনতে!

আসফাকের বুকের মধ্যে ধকধক করে উঠল–জানে, এরা সবই জানে তা হলে!

সাত্তার বলল, তা আসফাক, ভুলুয়া লাগলে বসে পড়া লাগে। হাঁটা লাগে না।

নসির বলল, বুঝলা না, সাত্তার, আমার বড়চাচার একবার লাগছিল ভুলুয়া। তা সে অন্যখানে।

নসির আর কী বলল তা আসফাক শুনতে পেল না, কারণ প্রথমে সাত্তার, তার পিছনে নসির এবং সবশেষে ছমির হালের পিছন পিছন আবার দূরে চলে গেল গল্প করতে করতে। ভুলুয়া লাগার গল্পই।

দূর থেকেই সে দেখতে পেল ওরা যেন হাসছেও। বিমর্ষ মনে সে ভাবল–ওরা নিশ্চয়ই গল্পটাকে বিশ্বাস করেনি। মিথ্যাটা ওরা ধরে ফেলেছে। তাছাড়া সকলেই জানে ভুলুয়া পিছনে লাগে বোকাদেরই।

হঠাৎ আসফাক উঠে দাঁড়াল। কী সর্বনাশই সে করে ফেলেছে। সাত্তার আর নসির হয়তো জানত না তার দেরি করে ফেরার কথা। তারাও এখন . জেনে ফেলল। একা থাকাই ভালো ছিল। এই আর এক বোকামি হল তার।

কিন্তু কী করবে এখন সে? কোথায় যাবে? যা সত্যি তা সকলের সম্বন্ধেই খাটবে। একটা অন্যায় দিয়ে আর একটা ঢাকতে গেলে, তারপর সেটা ঢাকতে আর একটা–এমন করে অন্যায়ের জাল তৈরি হল, আর তাতে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে। অন্যদিন কত কাজ থাকে হাতে। আজ তাও নেই। কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল আসফাক, সে তামাকের খেতের কাছে এসে পড়েছে। যতদূর চোখ যায় একখানা বাদামি কাগজ যেন বিছানো আর তার উপরে সমান দূরে দূরে সবুজের ছোপ। কিন্তু এখানে কেন এল সে? এখানে কী কাজ আছে? কথাটা চিন্তায় ফুটে ওঠার আগেই আবেগটা দেখা

দিল। এই খেতেই, এই তামাকের খেতে কাজ করতে গিয়ে জাফরুল্লার কাছে থাপ্পড় খেয়েছিল আসফাক একদিন। কানের মধ্যে ঝা ঝা করে উঠল আসফাকের। সে মাথা কাত করে কানটাকে কাঁধের উপরে চেপে ধরল যেন শব্দটাকে থামাতে। কোনো দিকেই এখন তার যাওয়ার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এখানে লোক নেই। এখানেই বসে ভেবে নেয়া যেতে পারে।

আলের উপরে বসল আসফাক।.চেষ্টা করে সান্ত্বনার মতো একটা চিন্তা নিজের মনে ফুটিয়ে তুলল সে। কানের মধ্যে আঁ আঁ করছিল–তা সে বোধহয় না খেয়ে থাকার জন্যে। কাল দুপুর থেকেই খাওয়া হয়নি তার। তারপর তামাকের খেতের খুঁটিনাটি লক্ষ করতে লাগল। তা এটা দেখার মতো কিছু বটে। তাকিয়ে দেখো, যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখো–একটা ঢিল দেখতে পাবে না, কিংবা একটা ঘাস। যে জমিতে গোবরসার দেয়ার জন্যই দুকুড়ি গোরুবাছুর আছে জাফরের। গর্ব করার মতো কিছু বটে। আসফাকের কৃষকমনে অকৃত্রিম প্রশংসার ভাবটাই দেখা দিল। সে নিজে বোধহয় এ জমির সব কাজ শিখতে পারেনি। এ জমির কাজ প্রকৃতপক্ষে কে-ই বা জানে? আর সেই কিনা গিয়েছিল তামাকের পাতা ঝুরতে। জল দেয়ার জন্য দহের মধ্যে যে টিউবকল, বসে তা পাম্প করো–আচ্ছা। জমির ঘাস তোলো খুঁটে খুঁটে–তাও খুব। কিন্তু পাতা ঝোরা? জাফর নিজে ছাতা মাথায় অষ্টপ্রহর, দাঁড়িয়ে থেকে মুনিষ দিয়ে পাতা ঝোরায়। আসফাক তাদের দেখাদেখি দা হাতে করে একটা গাছে কোপ দিতেই ছুটে এসে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল জাফর।

স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধি আছে জাফরের। সেই হেঁউতি বিছনের খেতটা ভাবো। আর কেউ কি ভাবতে পারে ডোঙা দিয়ে জল ঘেঁচে এই না-বৃষ্টির দিনে হেঁউতির বিছন বোনা যায়? আর এই তামাকের খেত? বুড়ো বুড়ো লোকেরাও তাকে জিজ্ঞাসা না করে এক পা এগোয় না এই তামাকের খেতে।

তা বুদ্ধি আছে বটে জাফরের। আটশো বিঘা জমি এখনো তার। নতুন। আইনে দুশো বিঘা খসেই নাকি এই। তখন ব্যাপারির বাড়িতে খুব গোলমাল লেগেছিল বটে। তারপর জাফর তা কাটিয়ে উঠল। চার বিবি তার, আর এক ছেলে। সকলের নামেই জমি লিখে দিল সে। শেষে বাড়ির পাঁচজন চাকরের নামে। আসফাকের নামেও জমি লেখা হয়েছিল তখন। তারপর জাফর সকলকেই একশো টাকা করে নগদ দিয়ে পাঁচহাজার টাকার খত লিখিয়ে নিয়েছে জমিগুলোকে খাই-খালাসি বন্দোবস্ত দেখিয়ে। বুদ্ধি আছে বটে। সেই জমিতে ধান হয়, আর তামাক।

আসফাক যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই সে ছমিরদের আবার দেখতে পেল। তাদের একজন ছিলিম ধরাতে বসল। অন্য দুজন গেল জাফরুল্লার বাড়ির দিকে। আজই বোধহয় ওরা ধান ছিটোবে।

হ্যাঁ, ধান। শুধু এ শব্দদুটোই তার মনে এল পুর্বাপর বিচ্ছিন্ন হয়ে।

দু-তিনটে আল পার হলেই সেই আল যেখানে ওদের তিনজনের একজন ছিলিম ধরাতে বসেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আসফাকের মনে হল–ও যদি ছমির না হয়ে সাত্তার কিংবা নসির হয় তবে কিছু খবর নেয়া যায় ওর কাছে। একটা প্রশ্ন হঠাৎ উঠল তার মনে–জানা দরকার জাফরুল্লা কখন ফিরবে। এটা ছমিরকেও জিজ্ঞাসা করা যেত। কিন্তু তা করা হয়নি। কিন্তু যদি ছমির হয়?

সে যেখানে বসেছিল তার কিছুদূরে একটুকরো জমি। দূর থেকে বাতাসে দোলা গাছগুলো দেখলে মনে হয় ধান। কিন্তু আউশ নয়। ছন বলে। ঘর ছাওয়ার ছন। কচি অবস্থায় বলদ খায়। কিন্তু বেশি খেলে সহ্য হয় না।

হঠাৎ ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। তারপর সে কড়ে গুনল সালগুলো। চার সাল হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হাসল খুঁতখুঁত করে। কেউ পারেনি ধান ফলাতে। ছনই হয়। তিন বছর প্রাণপাত করেছিল আসফাক। দশ বিঘায় আট-ন মণ ফললে খুব। চার সাল হল সে ওই জমি ছেড়েছে।

জমিটার দিকে অবাক হয়ে সে চেয়ে রইল। ওটার প্রায় চারিদিকেই জাফরুল্লার চৌরস সরস জমি। তার মধ্যে ওটা যে ওরকম তা কেউ ভাবতেই পারবে না। এত কচকচে বালিই বা কী করে এল এখানে তাও বোঝা যায়। না। কিন্তু তার চিন্তা ঘুরে গেল। জাফরুল্লা কখন ফিরবে এই ভাবতে ভাবতে এদিকে মন চলে এসেছিল।

সে স্থির করল আর দেরি করা উচিত হবে না। হয়তো ও ছমির নয়। আর–আর সেই ভুলুয়া লাগার গল্পটাকেও হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। দেরি করে ফিরেছে সে, কিন্তু খুব দেরি হয়েছে একথা স্বীকারই বা করবে কেন।

আল কয়েকটি পার হয়ে ধানবীজের জমিটার কাছে গেল আসফাক। ছমির নয়, সাত্তার।

কথা বলার আগেই আসফাক হাসল খুঁতখুঁত করে।

সাত্তার বলল, ছিলিম?

আসফাক হাত বাড়াল। ছিলিমটা দিল সাত্তার।

সাত্তার বলল, পিঁপড়ে চলতেছে। বৃষ্টি হতে পারে কিন্তুক।

আসফাক বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে কাশল। ছিলিমটা সাত্তারের হাতে ফিরিয়ে দিল।

বলল, পারে বোধহয়।

হলে হেঁউতির চাষ আগুই হবে মনে কয়। বলল সাত্তার।

আসফাক বলল, কী যেন বলব মনে হল।

কী বলবা, সেই ভুলুয়া সাত্তার হাসল।

আরে না–কী কও। আসফাক গড়গড় করে হাসল।

তারপর সে বলল, ব্যাপারি গেল কখন দেখছ না?

কেন সেই হাকিমের সঙ্গে। সন্ধের পর ভকভকি আসছিল তার। তারই সঙ্গে ব্যাপারি গেল। আর মুন্নাফও। হাকিমই পেড়াপিড়ি করল।

অ।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল আসফাকের। তার পরে সে আবার হাসল। ভারমুক্ত বোধ হল যেন হঠাৎ নিজেকে। সে একটু জোরে জোরেই হেসে উঠল দ্বিতীয়বার।

একটু পরে সে বলল, বুঝলা না, আচ্ছা, ও কীসের হাকিম কও তো।

কেন, শোন নাই? ডিস্টি বোডের। সড়ক নাকি হবে একটা তারই মাপজোখ।

তা– একটু ভাবল আসফাক, আচ্ছা—

কী?

লোকে কিন্তু দুঃখকষ্টের কথাও বলতেছে।

জমির উপর দিয়ে সড়ক যাবে। সে সম্বন্ধে দু-এক কথা হইছে।

ছিলিমটা সাত্তারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসফাক। নিঃশব্দে সে হাঁটতে শুরু করল। এ সব ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে এসে ধরানো ছিলিমে টান দিয়ে আবার কাজের দিকেই ফিরে যাওয়াই প্রথা। বিদায় দেয়া-নেয়ার জন্য বাক্যব্যয় করতে হয় না। অন্তত এখন প্রথার এই নিঃশব্দ দিকটা আসফাককে সুবিধা দিল। আশ্চর্য লাগছে। কাল বিকেল থেকে কী হয়েছে তার, একটার পর একটা জালেই যেন জড়িয়ে পড়ছে। কে জানত যে হাকিমটাও এমন? সে ভেবেছিল ম্যাজিস্টর!

আলের উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল সে। খুব একটা দরকারি কাজই যেন মনে পড়েছে। সেই ভঙ্গিতে চলতে চলতেই সে যেখানে বলগুলোকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এটার পিঠ চাপড়াল, ওটাকে ধাক্কা দিয়ে রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরিয়ে দিল। যেন সব কয়েকটি ঠিক খাচ্ছে কিনা দেখল। তারপর তাদের কাছাকাছিই একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। এখন ওরা সব খেতে গেল।

জাল ছাড়া আর কী? বিস্ময়ের জাল। এটাই তার সব বোকামির শেষ বোকামি–ডিস্টি বোডের হাকিমকে ম্যাজিস্টর ভাবা। বালি চিবিয়েছে সে।

আর তাও কিনা এমন হাকিম যে হয়তো সে সব কথা জাফরুল্লাকে বলেও দিয়েছে।

সব কথার সার কথা সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। উৎকণ্ঠায় ঢোক গিলল। আসফাক। কিন্তু এমন ঠকাই বোধহয় তার নসিব। চিরকালই ঠকতেও হবে।

ধীরে ধীরে একটা উদাসীনতায় তার মন ভরে গেল। এমন ঠকার পরে বোধহয় কিছুতেই কিছু এসে-যায় না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল সে। তার অনুভূতি হল সে যেন কথা বলছে জাফরুল্লার সঙ্গে। হ্যাঁ, শোধবোধ, ব্যাপারি, তোমার আমার শোধবোধ; না কথাটা বোধহয় তামাম শুধ। কী জানি। মোট কথা শেষ পর্যন্ত ওষুধ আনলেও আমিও খুব দেরি করেছি। অসম্ভব দেরি। কবুল। তা তুমিও মরো নাই।

হাকিমের কাছে থেকে সরে আসতে আসতে তার মন অস্পষ্ট ভাবে যেন একটা পুরনো পরিচয়ের সম্বন্ধই অনুভব করল জাফরের সঙ্গে। তা সাত সাল হল।

ধরতে গেলে ধীরে ধীরে জাফর তাকে অন্য চাকরদের থেকে আলাদা করে নিয়েছে। সেই থাপ্পড়ের ঘটনাটা ঘটলেও। তামাকের খেতে তাকে যেতে হয় না। ধানের খেতে বেচাল বর্ষায় ঘাস বেশি হলে দু-একদিন নিড়ানি নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু ভারি পরিশ্রমের কাজ ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। বলদদের দেখাশোনা, দড়ি পাকানো, রাখালদের খবরদারি করা, তামাক বানানো, বাজারসওদা করা–এসবই তার কাজের ফিরিস্তি। আর মুন্নাফ-তাও দেখো–জাফরুল্লা ব্যাপারির চার বিবির ঘরের এক ছেলে তার উত্তরাধিকারী, দশ বছরের সে ফুটফুটে ছেলেটার ডাক শোনো। কী, না, মিঞাসাহেব। কখনো সে আসফাক বলে না।

আর এ ছাড়াও প্রমাণ আছে। প্রায় তিন সাল পুরনো হল ব্যাপারটা।

জমি নিয়ে কাজিয়া। যদিও জাফরুল্লার বাড়িটা তখনই সবটুকু সাদা, তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে তার আট-দশজন চাকর-আধিয়ারকেও।

সে যখন যাচ্ছে আসফাককে ডেকে বলেছিল–আসফাক, বাপজান, ইদিক শোনো। সব দেখে শুনে রাখবা কেমন? আসফাক বড় ভালো ছাওয়াল। সেই দশবিঘা জমির কথা। ঘুষ?

এই শুনে, তাকে নিয়ে যেতে দেখে, আর জাফরের চার বিবি আর মুন্নাফের কান্নার সামনে আসফাকের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

সেবার প্রায় পনেরোদিন জাফর অনুপস্থিত ছিল। সে সময়ে আসফাক কী না করেছে। ধান তামাকের খেত-খন্দ দেখাশোনা তো বটেই জাফরের বিবিদের তদবির-তদারক পর্যন্ত। আর বলদ কটি, যা তার আসল জিম্মি,

তাদের চেহারা তেমন কোনোদিনই আর হবে না, যা সেই পনেরোদিন আসফাকের কাছে আদরযত্ন পেয়ে।

অবশ্য জাফর যখন ফিরে এসেছিল তখন তেমন খোঁজ নেয়নি তার। জাফরকে কোনোদিক দিয়ে ক্লিষ্ট দেখায়নি। বরং তারপর থেকে তার সাদা দাড়ি মেহেদি দিয়ে রাঙাতে শুরু করেছে।

জাফর কি তবে ঠাট্টা করেছিল তাকে? অমন অবস্থায় কেউ ঠাট্টা করে না।

না–তখন সে-ই বরং পালিয়ে বেড়িয়েছিল। আর তার কারণ ছিল। সে কথাটাই আবার মনে আসতে চাচ্ছে। গৃহপালিত পশু যেমন লাঠি দেখে শরীর গুটিয়ে নেয় তেমন যেন কথাগুলো তার মনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চাইল। উদাসীনতাটা ফেটে ফেটে যাবে মনে হল। তামাম শুধ বলে যে ঔদাস্যটা এসেছিল মনে।

বলদগুলোকে গাছের ছায়া দেখে বেঁধে দিয়ে আসফাক ফিরে চলল জাফরুল্লার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে ভাবল–কী করা যায় এখন? তার মনে হল দড়ি পাকালে হয়। কাল সারাদিনই তা হয়নি। কিন্তু এখন তো ঠিক কাজের সময় নয়। দুপুর হয়েছে। কাল থেকে খাওয়া নেই। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। রাত্রিতে ঘুম হয়নি।

সেই ফেরাই তো ফিরে এসেছে সে। এখন সব চুকে যাবে। এইরকম একটা মনোভাব হল তার।

দুপুরটা কাটল। খানিকটা ঝিমিয়ে, খানিকটা উদাসীনতায়। ছমির এসেছিল, চলেও গিয়েছে। সে চলে গেলে আসফাকের মনে পড়ল ছমির হাটে যাচ্ছে। সপ্তাহের হাট।

আসফাক ভারিঘরের বারান্দায় বসেই দড়ি পাকায়। সেখানেই উঁচু বাঁশের আড়াটায় পাট আছে, আর তার কাছে লাটাই। লাটাই ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দড়ি পাকাল আসফাক। তারপর তার বলদদের কথা মনে পড়ল।

সে যখন বলদদের খোঁজে যাচ্ছে, ছমিরের সঙ্গে আবার দেখা হল। ছমির তাহলে হাটে যায়নি। টাকাপয়সা ধামা আনতে অন্দরে গিয়েছিল।

মুখোমুখি দেখা হতে আসফাক বলল, হাটে যাও একা?

একা না। রাখালও যাবে।

ও, আচ্ছা। এই বলে আসফাক পা বাড়াল।

ছমির বলল, এক কথা–

কী?

আজ তো তুমি আছ। তা আমি আজ বাড়ি যাব। কী কও?

আর কে থাকবে?

কেউ না।

কেন ব্যাপারি?

আজ রাত্তিরে আসবে না।

ছমির চাকর বটে কিন্তু এই গ্রামেই তার বাড়ি আছে। কাল রাত্রিতে সে বাড়ি যায়নি। জাফরুল্লার বাড়িতে পাহারা দিয়েছে। আজ আসফাককে সে কাজের ভার দিয়ে সে বাড়ি যেতে চায়।

আসফাক বলল, আচ্ছা যায়ো।

এই বলে সে হাঁটতে শুরু করল।

সে হাকিমও কিনা ম্যাজিস্টর না। এই কথাটাই আবার মনে হল তার।

খানিকটা দূর গিয়ে সে ভাবল : ছমির আজ থাকবে না। তা হলে সেই যে আসফাক জাফরুল্লার ঘরবাড়ি পনেরোদিন পাহারা দিয়েছিল আজও তেমন হল।

কিন্তু তফাতও দেখো। সেবার সে বুক ফুলিয়ে বেড়াত। আর এবার?

ঘাড় কাত করে থুথু ফেলল আসফাক।

ঝোরার পাশ দিয়েই তার পথ। পথের ধারে একজায়গায় দু-তিনটে পিটুলিগাছ। আসফাকের মনে পড়ল জাফর একদিন বলেছিল–বড় গাছটাকে খড়ির জন্য কাটলে হয়। আসফাক স্থির করল এবারও যদি জাফরের দু-চারদিন দেরি হয় ফিরতে গাছটাকে সে কাটবে।

কিন্তু তফাত দেখো। সেবার যা ছিল এবার তা নয়। আর এসব কিছুর জন্যই দায়ী সেই হাকিম।

পিটুলিগাছটার নীচে একটা পুরনো গোবরের স্তূপ। অনেকটা উঁচু। উপরটা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। ঢিপিটার পাশে একটা বড় মোরগ চরছে। প্রকাণ্ড খয়েরি রঙের মোরগ। মাথার ঝুঁটি টকটকে লাল। আধা-ওড়া আধা-ছোটার ভঙ্গিতে সে ঢিপিটার উপরে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর পাঁয়তারা করার ভঙ্গিতে একবার ডান একবার বাঁ পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটা সরাতে লাগল। আর তখন আসফাক তার পায়ের বড় বড় নখগুলোও দেখতে পেল। পুরনো, সার হয়ে যাওয়া কিন্তু উপরের স্তরের চাইতে নরম গোবর বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ঠোঁট না নামিয়ে নিজের এই আবিষ্কারের গর্বে গলা ফুলিয়ে মোগরটা কক কক কক করে ডাকল। ঝপ করে একটা শব্দ হল। আসফাক দেখল মোরগটার কাছে একটা মোটাসোটা তার মতোই বড় মুরগি উড়ে এসে পড়ল। কিন্তু মোরগটা এক ধাক্কা দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল। সেটা ঢিপির একটু নীচে পা দিয়ে গোবরের স্তরটাকে

খাবলাতে লাগল। মোরগটাও আবার বড় বড় নখওয়ালা পা দিয়ে গোবরের আবরণটাকে ভাঙতে শুরু করল। ঝুপ করে আর একটা শব্দ হল। আর একটা মুরগি এসে পড়ল। আর তা দেখে মোরগটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন তার গোবরশৃঙ্গ থেকে নেমে পড়ল। যেন তার পুরুষোচিত পরিশ্রমের পথে এরা বাধাস্বরূপ। কিন্তু ঠিক তা নয়। গোবরের আড়াল থেকে আর একটি মুরগি আসছিল সেটিকেই পছন্দ হল তার। তার দিকে তেড়ে গেল।

আসফাক ঢিপিটার পাশ দিয়ে গেল। মোরগটা তাকে গ্রাহ্য করল না।

হাকিম তার মনের উপরে যে শক্ত স্তরটা জমেছিল সেটাকে ওই মোরগটার মতো খাবলে দিয়েছে। নীচের নরম কিছু বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল আসফাক। সেই পুরনো কথাটাই যেন আবার মনে পড়ল। সেবার যখন জাফর ফিরে এসেছিল আসফাক বেশ কিছুদিন পালিয়ে বেড়াত।

সারাদিন তার মনে যে উদাসীনতার ভাবটা ছিল সেটার চাপেই যেন সে ক্লান্ত হয়ে উঠল। যে বোঝা প্রথমে তোলার সময়ে হালকা থাকে অনেকক্ষণ বয়ে নিয়ে গেলে সেটাই সহ্যের বাইরে চলে যায়। হাঁপাতে লাগল আসফাক। বলদ যেমন স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিঃশব্দে হাঁপায়–তেমন করেই যেন হাঁপাতে লাগল সে।

বুদ্ধি আছে জাফরের। জমি রাখার মতো অন্য অনেক ব্যাপারেই তার বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এটাই যেন চিন্তা তার। কিন্তু অসংলগ্ন হয়ে গেল। সে হাসল খিকখিক করে–ওই মোরগটাই জাফরুল্লা। তারপর একটা উষ্ণতা তার মনে ঢুকে পড়ল এদিক ওদিক থেকে। ক্লান্তির মতোই সেই উষ্ণতা কিংবা ভয়ের মতো। ভয়েই যেন বিনবিন করে ঘাম ফুটল তার মুখে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তা সাত সাল হবে।

চালার নীচের লুকানো জায়গা থেকে নেমেই আসফাক হাঁটতে শুরু করেছিল। অবশেষে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিল সে যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময়েই চোখে পড়ে। আর দেশের চেহারাও বদলে গিয়েছিল। শালের জঙ্গল। তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি জোতজমা। হলুদ ফসল। তারপর আবার সবুজ বন। এমন করে বন আর কৃষকের জমি পর পর। সাধারণত মানুষ দিনে হাঁটে রাত্রিতে বিশ্রাম করে। আসফাক তখন উলটোটাই করছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে ব্যাপারটা অন্যরকম হল। আগের দিন সন্ধ্যায় পথের ধারের একটা জমি থেকে শসা চুরি করেছিল সে। কিন্তু আজ কী হবে এই ভাবতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুত দৃশ্য তার সামনে। জঙ্গলের মধ্যে নীল-নীল আলোর চোখ। আরো দূরে দপদপ করে মেটে-মেটে আলো জ্বলছে। তার কাছাকাছি সাদা-সাদা যেন কী সব। আর দু-এক পা এগিয়ে গিয়েছিল আসফাক আর

তখন সে আবিষ্কার করেছিল অস্পষ্ট আলোতে আট-দশটা মোষ চরছে। আর সেগুলোর পিছনেই চার-পাঁচটা তাঁবু। হাত তিনেক উঁচু একটা বাঁশের আড়ের উপর দিয়ে একটা করে রং করা কাপড় দুদিকে নামিয়ে এনে চারটে খোঁটায় কাপড়ের চার কোনা বাঁধা। সেই তাঁবুর মধ্যে পুরুষ মেয়ে শিশু। রান্না হচ্ছে। সকলে একই সঙ্গে কথাও বলছে, যেন ঝগড়া লেগেছে। কিংবা ভয় পেয়েছে।

এই তাঁবুর বস্তির কাছাকাছিই কমরুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। আর ক্ষুধাই ফিরিয়ে এনেছিল তাকে। চেয়েচিন্তে কিছু পাওয়া যাবে না?

আসফাক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল তাঁবু খুলে নিয়ে লোকগুলো কোথাও যাওয়ার যোগাড় করছে। একটা করে তাঁবু ওঠে আর মোষের পিঠে তাঁবু আর অন্যান্য সরঞ্জাম চাপিয়ে একটা করে দল রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তাঁবু উঠে গেল, সব দল রওনা হয়ে গেল। আর তখনই সে দেখতে পেয়েছিল খানিকটা দূরে যেন একটা মোষ তখনো বাঁধা আছে। হ্যাঁ, অন্য সব মোষ যেমন করে বাঁধা ছিল–একটা পা লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর একটা ঝোপের আড়ালে, অন্য তাঁবুগুলো যেখানে ছিল তার থেকে কিছু দূরে একটা ঘেঁছে তবুও যেন। আশ্চর্য, ভুলে গেল নাকি?

ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে তাঁবুটার একেবারে কাছে গিয়ে চমকে উঠেছিল আসফাক। সেই তাঁবু ছিল কমরুন আর তার স্বামীর। স্বামীর বসন্ত হয়েছিল, রাত্রিতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কমরুন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে সময়ের কথা সব মনে আসে না। আসফাক মনে। করতে পারে না, কেন সে না পালিয়ে কমরুনের কান্না শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ সে নিজের চিবুকে হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। কমরুন কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে নাক ঝেড়ে আর একবার কাঁদতে শুরু করার আগে আসফাককে দেখে থাকবে।

তারপর কবর দেয়া হয়েছিল কমরুনের স্বামীকে। একটা সুবিধাও জুটে গিয়েছিল। বর্ষার শেষে মাছ ধরার জন্য কারা একটা গর্ত করে রেখেছিল। সেই গর্তেই মৃতদেহটাকে রেখে নদীর চরার পাথরকুচি মিশানো বালি আঁজলা আঁজলা তুলে গর্তটাকে বুজিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এদিক ওদিক থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে আসফাক যখন সেই গর্তটার উপরে রাখছিল, বালিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল কমরুন।

বিকেলের দিকে কমরুন যখন তার তাঁবুর কাছে ফিরে এল তখনো আসফাক তার সঙ্গেই আছে।

কমরুন নতুন করে তাঁবু খাঁটিয়ে বসলে আসফাক বলল, খাবার নাই?–

আশ্চর্য ক্ষুধার কথাটা সে এতক্ষণ ভুলেই ছিল। এটা তার বোকামির লক্ষণ। যে আসল কথাটাই সে ভুলে গিয়েছিল। এর আগেও এমন হয়েছে

দু-দুবার। যে দুদিন তার বাপ-মাকে কবর দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু খাওয়াটা অত সোজা ব্যাপার নয়। কমরুনই বরং কতগুলো সরু সরু বাঁশের টুকরো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার একটু আগে। আসফাককে একটু দুরে থাকতে বলে সে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গিয়েছিল। বক সাবধানী শিকারি, কিন্তু বকের চাইতেও সাবধানে কমরুন একটা বাঁশের টুকরোয় আর একটাকে লাগিয়ে সরু লম্বা একটা নল তৈরি করে তাই দিয়ে একটা বককে ঠুকে দিয়েছিল। সেই বকটাকে পুড়িয়ে খেয়েছিল কমরুন, আসফাককেও দিয়েছিল খেতে।

কিন্তু স্বামীকে কবর দেয়ার পরের দিনে যে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটে গেল তার মতো আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছু নেই। এমনকী কমরুনের তাঁবুর কাছে দুই হাঁটুর উপরে হাত দিয়ে ঘের তৈরি করে তার মধ্যে আসফাকের মাথা গুঁজে বসে থাকাও তার তুলনায় কিছু নয়। খুব ভোর থাকতে উঠেই নদীর দিকে গিয়ে থাকবে কমরুন। মোষটাকে দড়ি ধরে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিল আসফাক। তারপর কমরুনকে খুঁজতে বেরুল! নদীর ধারে ধারে কিছুদূর গিয়ে কমরুনের বাঁশের টুকরো কটিকে দেখতে পেল সে। তার পাশে দুটো ডাহুক দড়িতে বাঁধা। একটা তখনো নড়ছে। কিন্তু কমরুন কোথায়? অবশেষে দেখা গেল তাকে। ঘাগরা জামা পাথরে রেখে সে স্নান করছে। পাহাড়ি নদী। স্বচ্ছ জল স্নানের উপযুক্তই বটে, কিন্তু এক হাঁটুর বেশি নয়। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখবে কমরুন এমন সুযোগ কোথায়?

সকালেই একটা ডাহুক পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছে। আর একটা বাঁধা আছে। কাল চলবে। কমরুন এতক্ষণ কী সেলাই করছিল। এখন শুয়ে পড়েছে তাঁবুর ছায়ায়। দুপুরে এখন কাজ নেই।

বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্মদরিদ্র আসফাক সেই প্রথম নারীদেহ দেখেছিল। তখন ঘাগরায় জামায় ঢাকা আছে বটে। আসফাক এখন ভেবে পায় না কী করে অমন সাহস হল তার। কমরুন তাকে ঘুসি মেরেছিল। সেই শক্ত ঘুসি কানে লেগে অন্য সময় হলে আসফাক অজ্ঞান হয়ে যেত কিন্তু সেই প্রথম আসফাক যেন আকাশের কোনো শক্তির সন্ধান পেয়েছিল বুকের মধ্যে। আর কী সর্বগ্রাসী মাধুর্য! কমরুনের মুখে, তার একটু খোলা ঠোঁটদুটিতে, নীল মীনা করা পিতলের নাকফুলে, আধবোজা চোখদুটোতেও একটা হাসি তারপরে ফুটে উঠেছিল।

এরপর মোষের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে কমরুন একদিন হাঁটতে শুরু করেছিল। আর তার পিছন পিছন আসফাক।

কমরুনই বা কী করবে? দলের সন্ধান পাওয়া গেলে আসফাক তার সঙ্গে। থাকত কিনা তা ভেবে লাভ নেই, হয়তো থাকত না। কিন্তু জাফর ব্যাপারির গ্রামে এসে অন্য একটা ব্যাপারও ঘটল। মোষটা যে বুড়ো তা কমরুনের কাছেই শুনেছিল আসফাক। তার একটা চোখের মণিও সাদা হয়ে

গিয়েছিল বয়সের জন্য। কিন্তু সে বার্ধক্য যে এমন তা বোঝা যায়নি। একদিন সেটা কাদার মধ্যে বসে পড়ল। দুদিন ধরে মোষের তদবির চলল। গাছগাছড়ার দাওয়াই যা জানা ছিল কমরুনের সে সব প্রয়োগ করা হল। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে এসে দেখা গেল শেয়াল খেতে আরম্ভ করেছে। সেই কমরুন এখন জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি।

তা বুদ্ধি আছে জাফরুল্লা ব্যাপারির। এখানে আসার মাস পাঁচ-ছয় পর থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, যদিও আসফাক তা তখন ধরতে পারেনি। কবেই বা সে ঠিক সময়ে ধরতে পারবে? তখন সেই বেলে ডাঙা জমি চষত আসফাক। কমরুন যেত জাফরের অন্দরে কাজ করতে। তারপর বন্দোবস্ত উলটে গেল। আসফাক সারাদিন জমিতে কাজ করত, আর কমরুন রাতভোর ব্যাপারির বাড়িতে ধান ভানত, চিড়ে কুটত। এই কৌশলে তফাত করে রাখল দুমাস। তারপর নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি–তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা।

কিন্তু, আসফাক নিজের অবস্থিতিটা বুঝবার জন্য এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু–। পিছন দিকে জাফরুল্লার বাড়ি চোখে পড়ল। চোখ মিটমিট করল সে। যেন দেখতে চায় না।

.

আসফাককে এখন কেউ দেখলে বলত পক্ষাঘাত হয়েছে। চোয়ালটা অবশ হয়ে গিয়েছে। মুখটা হাঁ করা।

.

সেই সেবার যখন জাফরুল্লাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

.

তখন একদিন বলদ বাঁধতে গিয়েছিল আসফাক দহের ধারে। বলদদের যখন সে বাঁধছে কেউ যেন মৃদুস্বরে ডেকেছিল আসফাক, ও আসফাক। বাতাসটায় জোর ছিল, শব্দটা ঠিক এল না। একবার সে মাথা তুলে শুনতে পেল কে যেন কুই করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বাতাসটা আরো জোরে উঠে পড়েছিল। পথের পাশের বড়-বড় ঘাস। সেগুলো বাতাসের তোড়ে ছপছপ করে গায়ে লাগছে। আসফাক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। ফাঁক খাওয়া এই ঝোড়ো বাতাসে ঝড় উঠবে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করল। এমন সময়ে বাতাসে ভেসে কী যেন একটা তার গায়ে এসে পড়ল। সেটা গড়িয়ে পায়ের কাছে পড়লে আসফাক দেখল টোপাকুল। সে বিস্মিত হল। এদিকে টোপাকুলের গাছ কোথায়? দহের ওপারে একটা আছে বটে। ওপারের টোপাকুল এপারে এসে পড়বে এত জোর বাতাসে? কাজেই সে ওপারের দিকে ফিরে তাকাল। আর তখন সে দেখতে পেল। সাঁকোর উপরে, সাঁকোটা প্রায় পার হয়ে এসে, দাঁড়িয়ে আছে

কমরুন। বাতাসে তার চুল উড়ছে। মাথার কাপড় খসে গিয়েছে। পায়ের কাছে এলোমেলো কাপড়ের ঢেউ ওঠানামা করছে। আঁচলে তার টোপাকুল। আঁচল সামলে, শাড়ি সামলে সে আর এগোতে পারছে না।

ও আসফাক, আসফাক।

কী?

নামায়ে দাও।

কমরুন। জাফরুল্লা ব্যাপারির চার নম্বর বিবি কমরুন।

আসফাক এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। আর তখন ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কোলে ওঠে তেমন করে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে কমরুন সাঁকো থেকে নামল। কেমন যেন লজ্জা পেয়ে হাসল সে। সাঁকো থেকে নেমেছে বটে কিন্তু তখনো পায়ে মাটি ছুঁলেও, কমরুন তার দুহাত দিয়ে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। একবার সে মুখ তুলল, আসফাকের মুখটা দেখল, তারপরে আসফাকের কাঁধের উপরেই মুখ রাখল। যেন তখনো সাঁকোটা পার হচ্ছে ।

তারপরে মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল সে আসফাকের মুখোমুখি। বাতাস আর একপাক খেলে গেল। খানিকটা ধুলো উড়িয়েও গেল। বাতাসের জন্যই কমরুনের পদক্ষেপগুলো অসমান হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে পথের ধারে বড়-বড় ঘাসগুলো যেখানে বাতাসে কাত হয়ে পড়েছে শুয়ে পড়ল কমরুন, যেন হঠাৎ পড়ে গিয়েছে। বাতাস যেমন শব্দ করছে তেমন যেন খিলখিল করে হাসল সে।

আসফাক বলল, পড়ে গেলা?

কমরুন হাসল। তার চোখদুটো (তার চোখে সুর্মার টান ছিল) ঝিকমিক করল। মুখটা গাঢ় বাদামি হয়ে উঠল। আসফাক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। আর তখন ধনুকের ছিলার মতো উঠে পড়ল কমরুন। হাসল সে। তারপর দৌড়ে পালাল।

কমরুনের অমন ভালো হয়নি। বিশেষ যখন জাফরুল্লা বিদেশে। তা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না। সেই বাতাসের মতোই তার রক্তের মধ্যে কী একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। তাতে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। তার চাপে কী হয়? সব নিষেধ, সব বাধা ভেঙে মানুষকে একটা দিশেহারা গতির মতো কিছুতে পরিণত করে। তার টান আর বাধার টান এই দুই রশির টানে দম ফেটে যায়। চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে যায় আর সে অন্ধকার যেন রক্তের মধ্যে এলোমেলো চঞ্চলতা তারই ঢেউ। দহের জল যেমন লাফাচ্ছিল তখন।

.

চাকররা সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই তাদের খাবার দেয়ার নিয়ম। আজও কিছুক্ষণের মধ্যেই ছমির এসে খেতে ডাকল। আসফাককে। কিন্তু নিজে সে খাবে না। বাড়ি যাবে। সে কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল। কিন্তু ছমিরদের দিনের কাজ শেষ হয়েছে। তাকে এখন কতগুলো কাজ করতে হবে। আসফাক বড়বিবির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বড়বিবি যথারীতি মোড়ায় বসে ফুরসি টানছে। তার সামনে গিয়ে ওষুধের শিশি আর পয়সা নামিয়ে রাখল আসফাক।

কে, আসফাক?

জে।

বড়বিবি হাসল। নিঃশব্দ হাসি কিন্তু তার মুখের পেশীগুলোর মধ্যে চোখদুটো ডুবে গেল হাসির দমকে।

হাসি থামলে বড়বিবি বলল, কেন, পথ হারাইছিলা?

জে।

আবার ফুরসিতে মন দিল বড়বিবি।

মেজবিবি আজ খাবারঘরের মালিক। কথা সে কার সঙ্গেই বা বলে? আসফাক আর তার মতো দুজন বারান্দায় উঠে বসতেই সানকি করে ভাত দিয়ে গেল মেজবিবি। একবারও সে কিছু জিজ্ঞাসা করল না আসফাককে। যেন এরকম কাণ্ড রোজই করছে সে।

খাওয়া যখন মাঝামাঝি হঠাৎ দমাদম পা ফেলে রসুইঘরে এল ছোটবিবি। তার পায়ের মল ঝমঝম করে বাজল। তার ভাব দেখেই বোঝা যায় এবার কী হবে। চাকররাও এ ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। মাঝে মাঝে যা হয়। ঘরের মধ্যে কথাগুলো চাপা গলায় হচ্ছে কিন্তু অন্যদিনের মতো বাইরে থেকেই কানে যাচ্ছে। মেজবিবির দিকে ছোটবিবি যদি অমন ছুটে আসে বুঝতে হবে ঝগড়া হবেই। এ ঝগড়ায় কে-ই বা দৃপাত করে এখন? আসফাকের কিন্তু কানে গেল কথাগুলো। আর তখন তার অনুভব হল সবই ঠিক আগের মতোই। মাঝখানে তার দেরির ব্যাপারটা। আর তাও এরই মধ্যে লোকে ভুলে যেতে বসেছে।

অবশ্য অতটা বলা ঠিক হয়নি। ঝি নিয়ে ঝগড়া শেষ করে ছোটবিবি আবার বার হল রসুইঘর থেকে। তখন আসফাকদের খাওয়া প্রায় হয়ে গিয়েছে। ধাপ বেয়ে নামতে নামতে থামল ছোটবিবি।

বলল, আসফাক?

জে।

পরী ধরছিল?

আসফাক লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল।

অন্য চাকররা অস্ফুট শব্দ করে হাসল।

অন্য চাকরদের বাড়ি যাওয়ার তাগাদা ছিল। ছিলিমে দুটান দিয়ে চলে গেল তারা। তখন আসফাক খুঁতখুঁত করে হাসল ছিলিম টানতে টানতে। পরী ধরার কথা বলেছে ছোটবিবি।

ছিলিমটা ঢেলে নতুন করে ছিলিম ভরল আসফাক। তা পরীর মতোই দেখতে বটে ছোটবিবি, সলসলাবাড়ির পথে আসফাককে পরী ধরুক আর নাই ধরুক। চোখের কী জেল্লা, নাকফুল আর কানফুলের কাঁচগুলোর চাইতে যেন সুর্মার টানের মধ্যে বসানো চোখের মণিদুটো বেশি ঝকঝকে। আর ঝগড়া–কী ঝগড়াই না করতে পারে। অমন যে আদরের মেজবিবি সেও পালাতে পথ পায় না। আজ রসুইঘরেও চুপ মেরে গিয়েছিল ছোটবিবির মুখের সামনে।

অন্ধকারে পা ছড়িয়ে বসল আসফাক। আরাম করে বসে ছিলিমে আগুন ধরাল। সবই ঠিক দেখো আগের মতোই। মাঝখানে হাকিম সাহেবের পাগলামি। অন্ধকারে স্নিগ্ধতায় তার শরীর জড়িয়ে আসতে লাগল। ছিলিম ঢেলে সে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। ছোটবিবির ঝগড়াটায় যে কৌতুক তাই যেন দিনশেষের রসিকতা যা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে যাওয়া যায়।

আসফাক ঝগড়াটা যেন আবার শুনতে পেল।

ছোটবিবি বলল, নুরীকে বলছিলাম পা দাবাতে।

এদিকেও তরকারি কোটা লাগে।

মানুষের তো ব্যথাবিষও হতে পারে।

বাব্বা! একরাত বাড়ি নাই তাতেই এত গায়ে ব্যথা।

সে বিষ হয় তোমার।

বেশ, হয়। নছিব করা লাগে।

অত দেমাক দেখায়ো না। নছিব? তবু যদি খ্যামতা থাকত।

খ্যামতা?

তা না? তা না হলে কমরুনবিবিকে আনা লাগে না। আমি আর বড়বিবি না হয় বাদ, তুমি কেন পতিত থাকলে?

বলদের ঘরে ঢুকে আসফাক শোয়ার যোগাড় করে নিল। কিন্তু তখনই শোয়া হল না তার। তার মনে পড়ল কিছু কাজ বাকি আছে। জাফরুল্লা বলেছিল কয়দিনের মধ্যেই তামাক বাঁধার চটি বাঁশ লাগবে। সোজা নয় প্রয়োজনটা।

পাঁচ-ছয়টা আস্ত বাঁশের চটি করতে হবে। তাও আবার মাপ মতো হওয়া চাই–লম্বায় পোন হাত, চওড়ায় দুই সুত, আর মোটা কাগজের মতো। তামাকের ডাটা একহাতে ধরে অন্যহাতে ভঁটাগুলোর উপরে তিন পাক বেঁধে দিতে হবে। কাল সকালে বাঁশ কাটা হয়েছে। শুকিয়ে গেলে চটি উঠবে না। আর ব্যাপারি ফিরে এসে যদি দেখে।

আসফাক তার মাচা থেকে উঠে দাঁড়াল। সে ঠিক করল দু-তিন ঘণ্টা কাজ করা যাবে এখন। আর তা করাও দরকার।

কিন্তু একটা টেমি না হলে কী করা যাবে? উঠে দাঁড়িয়ে সে অন্দরের দিকে গেল। বড়বিবির ঘরেই থাকে তেল। কিন্তু ভিতর থেকে ফুরসির শব্দ পাওয়া গেলেও ঘরের দরজা বন্ধ। রসুইঘরের দিকে আলো চোখে পড়ল। সেদিকে এগোতেই মেজবিবির গলার সাড়া পাওয়া গেল।

কে?

আসফাক।

কী চাই?

না। একটি টেমি।

ছোটবিবির দুয়ারে দেখো।

ছোটবিবির দুয়ারে টেমি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু একটু লজ্জাও পেতে হল। চাকর হলেও পুরুষ তো। বাড়িতে পুরুষ নাই, আর নুরীও পুরুষ নয়, কিন্তু আবরু থাকা দরকার।

কাটারি দিয়ে বাঁশ থেকে চটি তুলতে বসল আসফাক টেমির আলোয়। একবার তার মনে হল–আচ্ছা, তিন বিবিকে দেখলাম কিন্তু কমরুনকে দেখা গেল না। সে কি ব্যাপারির সঙ্গে গেছে?

তারপর সে কাজ করতে বসল।

টেমিটায় তেল নাই। মিটমিট করছে। রাত্রির অন্ধকারটাও গম্ভীর হয়ে আসছে। চটি তুলতে তুলতে অন্ধকারের দিকেও চাইছিল আসফাক। চারিদিক সুমসাম হয়ে গিয়েছে। বলদের ঘর থেকে মাঝে মাঝে বলদের নিঃশ্বাসের কানে আসছে। আর নিজের হাতের কাটারি বাঁশের উপরে যে মৃদু শব্দ করছে।

সেবার কিন্তু দড়ি পাকিয়েছিল আসফাক। সেবার মানে ওই যে পনেরো দিনের জন্য যখন জাফরুল্লাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তখন কিন্তু এমন সুমসাম হয়ে যেত বাড়িটা। আজও তেমনি। শুধু ব্যাপারি এবার তাকে দেখাশোনা করতে বলে যায়নি। তা হোক। কেমন একটা আলসেমি লাগছে। এবার সে শুতে যাবে। এই টুকরো কটা শেষ হলেই হয়।

কাজ করতে করতে হঠাৎ সে থামল। সেবার কিন্তু শোওয়ার আগে বাড়ির চারিদিকটা দেখে আসত। বিবিরা ঘরের দরজা দিল কিনা খোঁজ নিত। শুধু দহের পারের সেই ঘটনার পরের তিন-চারদিন সে শুধু বড়বিবির ঘরের সামনেই দাঁড়াত।

বাঁশ আর কাটারি সরিয়ে রাখল সে। উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করল। চিবুকে হাত রাখল। কিছু যেন একটা মনে আসছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না কী সেটা। সে ঘরের দিকে চলল। শোবে এখন সে।

কিন্তু এবারেও তার শুতে যাওয়া হল না। তার মনে হল কমরুনবিবিকে আজ সে দেখেনি। খবর নেয়া দরকার। সত্যি কি জাফর তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে? নিতে হলে মেজবিবিকেই নিত। খুবসুরত ছোটবিবিরও সে সুবিধে নেই। ওরা যেমন বেহিসেবি-বিবিরা দরজাটরজা ঠিকঠাক দিল কি তা দেখবার জন্য অন্দরের দিকে পা বাড়াল আসফাক। আর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ যেমন একটা আলসেমি লেগেছিল কাজ করতে করতে তেমন কিছু একটা অনুভব করল সে আবার। তারপর গা শিরশির করে উঠল। গলার কাছে উৎকণ্ঠা যেন একটা দলার মতো ঠেলে উঠল। আবার তার মনে পড়ল সেবারেও এমন নিঃসঙ্গ ছিল ব্যাপারির বাড়ি।

সে অন্দরের দিকে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সে অনুভব। করল–দেখো এ ব্যাপারটাও সে আগে বুঝতে পারেনি, অন্য সব ব্যাপারের মতো। ভাবো তো কতদিন দেখা হয় না কমরুনের সঙ্গে। সেবারের সেই সাঁকোর কাছে কথা হওয়ার পর আর কথাও হয়নি। অন্য বিবিদের তদারক না করে সে সোজা কমরুনের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তার রক্ত পাগল হয়ে উঠেছে।

কমরুন, কমরুন, ঘুমাও? ওঠো। ফিসফিস করল আসফাক।

কমরুন তখনো ঘুমোয়নি। ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বসে কী একটা সেলাই করছে সে।

ডাক শুনে কমরুন সেলাই নামাল হাত থেকে। উঠে এল জানালার কাছে।

কে! সর্বনাশ! আসফাক? কমরুনের মুখ, একেবারে রক্তহীন হয়ে গেল।

সে ফিসফিস করে বলল, ব্যাপারি বাড়ি নাই।

জানি।

তা হলে। কমরুন যেন হাঁপাচ্ছে।

যন্ত্রলিতের মতো কমরুন দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দিয়ে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

আসফাক কমরুন কী বলবে খুঁজে পেল না।

আসফাক বলল, কমরুন, কী খুবসুরত দেখায় তোমাকে।

কমরুন বলল, রাগ করো না, আসফাক, আমি একটু ভেবে নিই। তুমি বোসো।

আসফাক কমরুনের দিকে চেয়ে রইল। হলদে সাদায় ডুরি একটা শাড়ি পরনে তার। গলায় একেবারে নতুন একটা রুপোর চিকহার লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করছে। আসফাকের বাঁদিকে কমরুনের বিছানা। মশারিটা তোলা। সাদা ধবধবে বিছানায় দু-একটা মাত্র কোচকানো দাগ।

কেন কমরুন—

কী আসফাক?

তুমি কেমন আছো তাই খোঁজ নিতে আসছিলাম।

তুমি রাগ কোরো না আসফাক।

না। রাগ কী!

দরজার কাছে ফিরে গেল আসফাক।

কমরুন এগিয়ে এল।

আসফাক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, দুয়ার দেও কমরুনবিবি।

যন্ত্রচালিতের মতো দরজা দিতে গিয়ে থামল কমরুন। ফিসফিস করে বলল, শোনো। আমি মুন্নাফকে শিখায়ে দিছি। আমি যতদিন বাঁচব সে তোমাকে মিঞাসাহেব কয়ে ডাকবে।

আসফাক ফিরে গেল বিবিদের তদারক করে।

নিজের শোবার মাচাটায় গিয়ে বসে তার যে অনুভূতি হল কথায় দাঁড় করালে তার অর্থ হয়–এ কমরুন সে কমরুন নয়।

কোনো কোনো কথা আছে উচ্চারণের সময়ে তার যতটা অর্থবোধ হয়। পরে তার চাইতে বেশি গভীর মনে হতে থাকে।

কথাটা তো ঠিকই–এই ভাবল আসফাক–জাফরুল্লা ব্যাপারি তাকে অন্য চাকরদের চাইতে আলাদা দেখে। তা না হলে, সেবার তাকেই বা সব কিছুর ভার দিয়ে যাবে কেন? আজ কমরুনও বলছে সে মুন্নাফকে শিখিয়ে দিয়েছে। যাতে সে আসফাককে মিঞাসাহেব বলে ডাকে। একে যদি খাতির না বলে কাকে বলবে?

মিঞাসাহেব, মিঞাসাহেব না? এই বলল আসফাক মনে মনে হাসলও সে।

কিন্তু ঠিক ওভাবে বলল কেন কথাটা কমরুন? অবাক কাণ্ড দেখো, কমরুনের কথাবার্তা কেমন বিবিসাহেবদের মতো। হঠাৎ যেন চিড় খেল তার সামনের অন্ধকারটা। এদিক ওদিক তাকাল সে। আসলে তা তো নয়। আসফাকের মনেই কথাটা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠেছে। কেন, কারুনবিবি ওভাবে ওকথা বলে কেন? রাগ করতে নিষেধ করে সে তা না হয় বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে ওকথা কেন? এমন ঠাট্টা জাফরুল্লার অসাক্ষাতে চাকররা করে বটে। তা দু-একবার শুনেছে আসফাক। কিন্তু তারা তো কত কী-ই বলে– বড়বিবির নাকি রোজ এক বস্তা চিড়ে লাগে নাস্তায়। ছোটবিবি নাকি রাত্রিতে উড়ে কোথায় যায় সে জন্যেই তার চোখদুটো অমন ধারালো। মেজবিবি নাকি মন্তরে বশ করেছে ব্যাপারিকে। দাড়িতে যে রং দেখো সেটাই ওষুধ মেজবিবির। তেমনি মুন্নাফ সম্বন্ধেও একটা ঠাট্টা আছে তাদের।

আসফাকের মনের এই চিড়খাওয়া ফাটল দিয়ে বিবিদের ঝগড়ার কথাগুলো ভেসে উঠল। মেজবিবির সঙ্গে ছোটবিবির ঝগড়া। ঝগড়াটা ঠিক নয়। ঝগড়ায় যে সংবাদ ছিল। মেজবিবিও তা হলে পতিত থাকল কেন? কমরুনবিবি কি তা হলে মুন্নাফকে কোমরে নিয়েই ঢুকেছিল ব্যাপারির ঘরে? আর তা যদি হয়, তবে মুন্নাফ কি? সে জন্যই কি মুন্নাফ তাকে নাম ধরে : ডাকে না, আর তার মা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে আসফাককে সম্মান করতে।

আর জাফর কি জানত? জেনেই, কমরুনকে দেখে তার অবস্থা বুঝতে পেরেই তাকে নিকা করেছিল?

.

অদ্ভুত কথা তো! ভারি অদ্ভুত কথা! এছাড়া কোনো কথাই তার মন তৈরি করতে পারল না। আর কথা তৈরি না হলে কি চিন্তা করা যায়? কিন্তু চিন্তা কখনো কখনো বুকের একটা কোণও ভরতে পারে না। সেই খালি অংশগুলোতে যেন এই রাত্রির অন্ধকারও ধূসর হয়ে উঠতে লাগল, কখনো যেন সেই আকাশে চোখে দেখা যায় এমন মেটে রঙের বাতাস বয়ে গেল, কখনো গোটা আকাশটাও গলে গলে ধরা হয়ে নেমে এল কোনো কালো রঙের ধানখেতের উপরে, যার বুকে একটা কাঠি পোঁতা অনেক স্রোতকে বিভক্ত করে। হাকিম সাহেবের কথা নয়। আরো গভীর আরো ব্যাপক কিছু। এমন টান এই স্রোতের।

ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল আসফাকের। ধড়মড় করে সে সজাগ হল। ঠিকই শুনেছে যেন সে, জাফরুল্লা ব্যাপারি তাকে ডাকছে। মাচার উপরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সকালের দিকে বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল তার। অনেক বেলা হয়ে গেলে যেমন করে চাকররা তেমন করে চোখ ডলে মাচা থেকে নামল সে।

কিন্তু জাফরুল্লা নয়। মুন্নাফ ডাকছিল। বেলা একটু হয়েছে। কিন্তু যতটা আশঙ্কা করেছিল তা নয়।

.

মুন্নাফ বলল, উঠছ আসফাক!

উঠলাম। কখন আসলে? আসফাক হাসল বিবর্ণ মুখে।

ভোরে।

কেন, শহর থেকে রাত্তিরে রওনা দিছলে? আন্ধারের পথ তো।

লরিতে আসলাম যে। তা দেখো নাই! আব্বাজান লরি কিনছে একখানা। সে জন্যেই তো শহরে যাওয়া।

ও।

এখন থেকে আর গোরুগাড়িতে তামাক পাট যাবে না বন্দরে। লরিতে যাবে। কী ভকভক হরন। আর কত বড় বড় চাকা। ডারাইবারও আসছে।

ও। তা মুন্নাফ।

আর মুন্নাফ না। শোন তোমাকে এক কথা কই, আসফাক। বলদ এড়ে দাও। আব্বাজানের ঘুম ভাঙার আগেই বলদ নিয়ে দূরে চলে যায়ো। আম্মা কয়ে দিয়েছে।

আসফাক বলদের গলার দড়ি খুলে দিতে লাগল। বারোটা বলদই বেরিয়ে পড়ল দিনের আলোয়।

মুন্নাফ দরজার কাছ থেকে কিছুদূরে সরে গিয়েছিল।

সেখান থেকে সে ডাকল, শোনো, আসফাক, আর এক কথা কই।

আসফাক এগিয়ে গেল। তার বুকের ভিতরে ভয় ধকধক করতে লাগল। সেই গল্প জানো তো? খুরপি চুরির জন্য চোরকে ধরলে খুঁজে খুঁজে তার সব পুরনো চুরি ধরা পড়ে। কিন্তু কী আর গোপন থাকবে? সে তো নিজেই নিজের কাছে ঢাকতে পারছে না। দেরি তো দেরি, হাকিমসাহেবকে যা বলেছে তা নিজেও সে ভুলতে পারছে না। গোপন করাও যাবে না। জাফরুল্লা এসে গেছে, জাফরুল্লা এসে গেছে। সেবার তবু সেই দহের ধারে উশকোখুশকো চুল ছিল কমরুনের, সাদামাটা শাড়ি ছিল পরনে।

আম্মা বলেছে আব্বা খাওয়া-লওয়া করে না শুলে তুমি বাড়িতে আসবা ।

আসফাকের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। একটু ইতস্তত করল সে, কী ভাবে আরম্ভ করা যায় তা খুঁজতে দেরি হল।

কেন, মুন্নাফ, তুমি আর মিঞাসাহেব বলবা না আমাকে?

মুন্নাফের মুখে লজ্জার মতো কিছু একটা ভাব দেখা দিল, না। আব্বা বলছে চাকরকে তা বলা লাগে না।

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ডাকল–আসফাক।

কে যেন কয়? চিনতে কি ভুল হয়? এই বজ্রগর্জনের মতো স্বর। টিনের দেয়ালের ঘরের জানালা খোলা। সেই খোলা জানালায় মেহেদি-রাঙানো দাড়ির খানিকটা দেখা গেল।

আসফাক বলদগুলোর পিছনে দৌড়ে চলার মতো হাঁটতে শুরু করল।

আকাশের চেহারা ভালো নয়, আসফাক। বলদ দূরে নিস না।

আকাশের দিকে তাকালো আসফাক। আকাশে কালো মেঘ নেই। দিনের আলোয় যে আকাশ ঝকঝক করে তাও নয়। এমন নোংরা আকাশ আর কোনোদিনই দেখেনি সে। বলদদের ঘরের মেঝের মতো কাদামাখা যেন। আর রাত্রিতে ঘুম না হলে যেমন হতে পারে তেমন ফ্যাসকা। মোটকথা এমন রংচটা আকাশ সে আর কখনো দেখেনি।